# এখন ডুয়ার্স

ফেব্রুয়ারি ২০১৯। ২০ টাকা

## গণতন্ত্র ৭০

ভূকম্পের এপিসেন্টার এবার কি বাংলা?

মোদি বিরোধিতার ঝাঁঝ কতটা?

একুশে: এপারে কেবল মন্ত্রোচ্চারণ?

জংলীবাবার মন্দির

## এই সংখ্যায় যা আছে


সম্পাদকের কলমে ৩

**বিশেষ নিবন্ধ**

ধর্মের বেড়া ভেঙে যে সম্প্রীতির ইতিহাস পৌঁছয় নি সাধারণ ভারতবাসীর কাছে! ৬

**বিশেষ প্রতিবেদন**

ওপারে লালন ও পালন, এপারে কেবল মন্ত্রোচ্চারণ ৮

**নির্বাচন স্পেশাল**

রাজনৈতিক ভূকম্পের এপিসেন্টার এবার কি বাংলা? ১০

দেশ জুড়ে মোদি বিরোধিতার ঝাঁঝ কতটা বাংলায় বসে বোঝা যায়? ১৩

**উত্তরপক্ষ**

শপিং বিবর্তন, মহাবণিকের সুদিন, বাকিদের লাভের ঘরে সেই শূন্য ১৬

**ডুয়ার্সের হেথা হোথা**

ডুয়ার্স থেকে দার্জিলিং, তৃতীয় পর্ব ১৮

**শ্রীমতি ডুয়ার্স**

শবরীমালা! নারীদের জন্য ঈশ্বরের দুয়ার আজ কতখানি অবারিত? ২০

আমার মেয়েবেলা ২৪

**পর্যটন**

জংলীবাবার মন্দির ২২

**ধারাবাহিক ডুয়ার্স**

মহারাণী কথা ২৬, লক্ষ্যভ্রষ্ট পঞ্চশর ৩০

**শিলিগুড়ি ডায়েরি**

কোন পথে যে চলি! ২৯

**বইপত্র**

বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী:

উত্তরবঙ্গের অনামী ব্রাত্য আখ্যান কাব্য ৩৩

**নিয়মিত বিভাগ**

খুচরো ডুয়ার্স ৪, রাসায়নিক রস ৩৫


## এখন ডুয়ার্স পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

| | |
|---|---|
| **শিলিগুড়ি** | |
| বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড | ৯৪৩৪৩২৭৩৪২ |
| **শিবমন্দির** | |
| অনুপ দাস, শিবমন্দির বাজার | ৯৮৩২০২৯৫১৪ |
| **জলপাইগুড়ি** | |
| ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে | ৯৭৩৩২৪৬৯১৩ |
| **মালবাজার** | |
| সম্রাট (হোম ডেলিভারি) | ৯৩৩২০০৫৮৬৫ |
| **চালসা** | |
| দিলীপ সরকার, চালসা মোড় | ৯৭৭৫৪১৫১৪৪ |
| **বিন্নাগুড়ি** | |
| রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল | ৯৪৩৪৮০৯৫৯০ |
| **বীরপাড়া** | |
| বরুন ঘোষ, পোকিসা | ৯৫৯৩৩৫৪১৫২ |
| **মাদারিহাট** | |
| জগৎ চৌধুরী (হোম ডেলিভারি) | ৯৭৪৯৭২৫৭৮১ |
| **লাটাগুড়ি** | |
| সৌমেন (হোম ডেলিভারি) | ৯০০২৪০৯৮৯৩ |
| **ময়নাগুড়ি** | |
| দেবাশিস বসুভাট | ৯৯৩৩১৯০৮৫৮ |
| **ফালাকাটা** | |
| অমল চন্দ্র পাল | ৯৪৩৪৪১২৬৪৯ |
| **তুফানগঞ্জ** | |
| আনন্দবাজার বুক স্টল | ৯৩৩৩৬৮৮৬৭১ |
| **দিনহাটা** | |
| হরিপদ রায় | ৯৯৩২৬৩৯০৬৮ |
| **আলিপুরদুয়ার** | |
| দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট | ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭ |
| **কোচবিহার** | |
| জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে | ৯৪৩৪২১৭০৮৪ |
| **মালদা** | |
| অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি | ৯৯৩২৯৬৭৯৯১ |
| **বালুরঘাট** | |
| মাধববাবু | ৯১২৬২৬০৬৬৩ |
| ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন | ৯৮৩০৪১০৮০৮ |

**কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক** বিশাল বুক সেন্টার ৪০৬৪৪০৯৭

এখন ডুয়ার্স

পঞ্চম বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯

**সম্পাদনা ও প্রকাশনা**
প্রদোষ রঞ্জন সাহা
**ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান**
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
**সহকারী সম্পাদনা**
শ্বেতা সরখেল
**অলংকরণ**
শান্তনু সরকার
**সার্কুলেশন**
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া
**মুদ্রণ** অ্যালবাট্রস
**ইমেল**
ekhonduars@yahoo.com

**প্রচ্ছদ**
সাত্যকি বিশ্বাস

**ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস।**
অনিমা ভবন। শান্তি পাড়া।
জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

**সম্পাদকের কলমে**

# অন্তিম অভিবাদন যোগেশ বর্মণ

ডুয়ার্সের বনভূমিতে এসময় বইতে শুরু করেছে বসন্তের বাতাস। পর্ণমোচীরা বদলে দিচ্ছে অরণ্যের রং। শীতের চড়ুইভাতি ঝড়ে শ্রান্ত নদীর তীরে বালি তুলে নিয়ে যাওয়া লরিরা যদিও ক্লান্তিহীন, তবু পরিযায়ী পাখিদের অজস্র ডানায় ভর করে মেঘহীন খর রোদ্দুর বয়ে নিয়ে আসে হিমেল সন্ধ্যা থেকে ভোর। জঙ্গলের মনোহরা রূপ উপভোগ করতে আসা ইকো টুরিস্ট জলপাই-রং-জিপসি চেপে যখন ঢুকে পড়ে ন্যাশনাল পার্কের অন্দরমহলে, তখন সে জানতেই পারে নি ডুয়ার্সভূমি থেকে বহুদূরে দাক্ষিণাত্যের কোনও হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ডুয়ার্স অরণ্যের এক মহাসৈনিক ভুমিপুত্র। যাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় একদিন অতিথি আপ্যায়নে সেজে উঠেছিল ডুয়ার্স অরণ্য, ইকোপর্যটনের প্রথম পাঠ নিতে ছুটে ছুটে আসতে শুরু করেছিল প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ। আর জঙ্গল সংলগ্ন মানুষ সম্ভবত প্রথমবার জানতে পেরেছিল এই জঙ্গলই তার বেঁচে থাকার উৎস, একে বাঁচিয়ে রাখতে হবে যে কোনও মূল্যে, বনকর্মীদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে তারাই আসল বনরক্ষী।

দক্ষিণের বিশ্বখ্যাত বাদাবন বাদ দিলে উত্তরের অরণ্যভূমিতেই হেলায় পড়ে আছে বাংলার প্রাকৃতিক সম্পদের আকর। যে সম্পদের আংশিক ব্যবহারই ঘুচিয়ে দিতে পারে শিল্পহীন ডুয়ার্সের দুঃখদুর্দশা। বাকি দুনিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে ইকোপর্যটনের সূচনা হলে আপনা আপনিই আসবে জল-জঙ্গল-জনজাতি সংরক্ষণ ভাবনা— ফলতঃ জঙ্গল প্রভুদের মৌরসী পাট্টা লুঠতরাজ অচিরে কমে আসতে বাধ্য, তার জন্য অযথা 'বিপ্লব' করবার প্রয়োজন নেই। বোধ করি মন্ত্রী হওয়ার অনেক আগেই এই সত্যিটা অনুভব করেছিলেন নিজের মাটির সঙ্গে মিশে রাজনীতি করা যোগেশ বর্মন। আর মন্ত্রী হয়েই পাশে পেয়ে গিয়েছিলেন একগুচ্ছ বন কর্মী ও আধিকারিককে, যারা ভালবাসেন জঙ্গল পাখি বন্যপ্রাণ, যারা মনেপ্রাণে বন সংরক্ষণে বিশ্বাসী। দশটা বছর পেয়েছিলেন যোগেশবাবু, গত শতাব্দীর শেষ থেকে নতুন শতকের দোরগোড়ায় পৌছে দিয়েছিলেন এ রাজ্যের বনজ সম্পদ সংরক্ষণের ভাবনাকে। মূল্যবান কাষ্ঠসম্পদ ভাণ্ডার গড়ে তোলার যে পরিকল্পনায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল জঙ্গলের ঘাসভূমি, জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্র এক শ্রেণীর বনকর্তার অবিমৃষ্যকারিতায়, সেখান থেকে একশ আশি ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে বনদপ্তর নতুন করে শুরু করল ইকোলজিকে টিকিয়ে রাখার উদ্যোগ, ইকো পর্যটনকে নেওয়া হল তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে। পর্যটন বা বন উন্নয়ন নিগমের সঙ্গে নয়, বন্যপ্রাণ বিভাগ বনবসতির মানুষদের সঙ্গে নিয়ে শুরু করল সেই অভিনব ইকো পর্যটন উদ্যোগ। সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্ক থেকে শুরু করে গরুমারা-জলদাপাড়া হয়ে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত কলসদ্বীপ পর্যন্ত ব্যপ্ত সেই উদ্যোগে সাড়া পড়ে গেল, কেবল এরাজ্যে নয়, গোটা দেশের প্রকৃতিপ্রেমীদের মধ্যে। উত্তরের সুপারহিট স্পট হয়ে উঠল চটকপুর, কালিপুর, ধূপঝোরা, পানঝোরা, সাউথ খয়েরবাড়ি, কুঞ্জনগর ইকোক্যাম্প। বনবাংলো, নজরমিনার, প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্রগুলি সেজে উঠেছিল নতুন উদ্দীপনায়। গরুমারা পেল দেশের সেরা ন্যাশনাল পার্কের শিরোপা। নতুন প্রজন্মের ইকো পর্যটকের অবশ্য এত কিছু জানতে বয়েই গেছে!

**পর্যটন বা বন উন্নয়ন নিগমের সঙ্গে নয়, বন্যপ্রাণ বিভাগ বনবসতির মানুষদের সঙ্গে নিয়ে শুরু করল সেই অভিনব ইকো পর্যটন উদ্যোগ। সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্ক থেকে শুরু করে গরুমারা-জলদাপাড়া হয়ে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত কলসদ্বীপ পর্যন্ত ব্যপ্ত সেই উদ্যোগে সাড়া পড়ে গেল, কেবল এরাজ্যে নয়, গোটা দেশের প্রকৃতিপ্রেমীদের মধ্যে। উত্তরের সুপারহিট স্পট হয়ে উঠল চটকপুর, কালিপুর, ধূপঝোরা, পানঝোরা, সাউথ খয়েরবাড়ি, কুঞ্জনগর ইকোক্যাম্প।**

যোগেশবাবু কোন দল করতেন, মানুষ কেমন ছিলেন, কীই বা ছিল তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ— এসবের অনেক উর্ধ্বে উঠে ধরা পড়ে তাঁর বনভূমির প্রতি প্রগাঢ় দায়িত্ববোধ ও নিবিড় ভাবনা, যা আজকের নিরিখে এক অভাবনীয় ব্যতিক্রম নিঃসন্দেহে। 'এখন ডুয়ার্স'-এর আবির্ভাব হয়েছে অনেক পরে, যোগেশবাবু তখন বিধায়ক বা মন্ত্রিত্ব থেকে অবসৃত প্রবীণ রাজনৈতিক কর্মী। 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকা তিনি নিয়মিত পেতেন বা পড়তেন কিনা জানা নেই। তবু যখনই গিয়েছি তাঁর কাছে, সাদরে অভ্যর্থনা জানাতেন। খেতে এবং খাওয়াতে ভীষণ ভালবাসতেন মানুষটা। ফেসবুকের অভ্যেস শুরু করতেই বন্ধুত্বের অনুরোধ পাঠাতে ভোলেন নি। বছর তিনেক আগে ফালাকাটায় 'এখন ডুয়ার্স' আয়োজিত কলকাতার 'চার্বাক' নাট্যগোষ্ঠীর শো-তে নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছিলেন। নাট্যগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য অভিনেতা ও বন্যপ্রাণপ্রেমী সব্যসাচী চক্রবর্তীরও বিশেষ অনুরোধ ছিল। পাশে উত্তরসূরী বিধায়ক অনিল অধিকারিকে নিয়ে উপভোগ করেছিলেন পুরো নাটক। হাসতে হাসতে চোখে জল, শো-এর শেষে ধুতির খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে বলেছিলেন, বহুদিন পরে এত হাসলাম, অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাই! আমরা বলেছিলাম, এটুকু তো আপনার প্রাপ্য হতেই পারে দাদা!

ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার আগেই যোগেশ বর্মণকে বনদপ্তর থেকে সরে যেতে হয়েছিল। অর্থাৎ প্রমাণিত হয়েছিল তিনি ঠিক পথেই হাঁটছিলেন। তাঁর কর্মকাণ্ডে উজ্জ্বল দিনগুলিতে কমবেশি যারা যুক্ত ছিলেন সবাই তাঁর অকাল প্রয়াণে নিভৃতে দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলেছেন। যেমন ব্যথাতুর আমরা, তেমনই আফশোষ রয়ে গেল যোগেশবাবুর সেই অরণ্যের দিনরাত্রিগুলি লিপিবদ্ধ না করতে পারার। আজ বসন্তের হাওয়া বড়ই উদাস। ডুয়ার্সের জঙ্গলে ক্রমে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ম্রিয়মান ইকোক্যাম্পগুলি যেন ফিসফিস করে, এই কথাটি মনে রেখো... জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায় মনে রেখো...

## শর্ট সার্কিট বেঞ্চ

কলিকাগ্রাম কক্ষে সমিতির আখড়ায় ভোটের তাপ লাগিয়াছে। সদস্যদের বাক্যুদ্ধে ভির্মি খাইয়া পরিযায়ী পক্ষিগণ ভোরের আলোয় ডেরা বাঁধিয়াছে। ট্যিউফ্টেড ডাকেদের প্রতিনিধি সাফ বলিয়া গিয়াছে, আখড়ার বিরুদ্ধে মানেকাদেবীর নিকট অভিযোগ করিবে। হেনকালে প্রধানমন্ত্রী আসিয়া বৈকুণ্ঠপুরে সার্কিট বেঞ্চি চালু করিয়া দিয়া কহিলেন, তিনিই করিলেন। না করিলে হইতই না। এই ঘটনার পর হইতে আখড়ার অন্যতম বাক্যোদ্ধা নরহরিবাবু ঝিমাইয়া গেলেন। বাক্যুদ্ধ আর জমে না। নরহরিবাবুর এ কেমন ডিপ্রেসান?

অতঃপর মুখ্যমন্ত্রী পুনরায় বেঞ্চুদ্বোধনের দিন ঘোষণা করিতে ডিপ্রেসান কাটিল। মহাতামাক সেবন করিয়া, জিলিপি চিবাইয়া কহিলেন, খরচা করিয়া, ধার করিয়া নতুন আবাস নির্মাণ করিয়াছি। বোশেখ মাস গৃহপ্রবেশ। কিন্তু স্বপ্নে দেখিলাম তিনি আসিয়া গৃহোদ্বোধন করিয়া কহিলেন, মিত্র! বানাইয়া দিলাম!

কী সব যা তা ডিপ্রেসান! মাথা গরম হইয়া গেল। ধ্যানে বসিয়া শান্ত হইবার পর নোটবুক খুলিয়া দেখিতে বসিলাম খুচরো কেমন জমিয়াছে। কিন্তু ইহা কী লিখিয়াছি নোটবুকে? নিজের রচনা নিজেই বিস্মিত হইয়া পড়িলাম—

## তৃণহাতি

হাতিরা কি তৃণমূল? সংবাদদাতা লিখিয়াছে, দেবী চৌধুরানীর পুজোয় হামলা হইতে পারে তাই ডেট বদল করিবার কথা ভাবা হইতেছে। পুজো মানেই তাহা বেদ। বেদ মানে পদ্ম। অর্থাৎ পূজা মানে বেদ মানে পদ্মফুল ভন্ডুলকারী অর্থ, ঘাসফুল। শিমলাডাঙ্গির হাটে নিকট উক্ত পূজাস্থানের চারিদিকে হাতিরা এমন হামলা চালাইতেছে যে পাব্লিক আর পথে নামে না। পাব্লিক না আসিলে আসন্ন পূজা জমিবে কী ভাবে? পূজা না জমিলে মেলা জমিবে না। কমিটির ঘোরতর আশঙ্কা, মেলা বসিলেই হাতির নাগরদোলা চড়িতে আসিবে। জিলিপি সাবাড় করিয়া পয়সা দিবে না। হিন্দু হাতি হইলে এমন সাহস পাইত? নির্ঘাৎ সেকুলার এলিফ্যান্ট। অতএব, হাতিদের হাতে ঘাসফুল পতাকা ধরানো হইয়াছে।

## শ্রমিক স্যার

সাম্যবাদ কোথায় আছে? কেন? ধূপগুড়ির শালবাড়ি গ্রামে! সেথায় সবাই শ্রমিক। শ্রমিকের সরকার যাহারে কয়! কয়দিন পূর্বে যখন পকেটে টাকা কম পড়িতেছে, তখন একজন বুদ্ধি দিল শালবাড়ি গিয়া একশো দিনের কাজে নাম লিখাইতে। কহিলাম, ‘আমার নাম নিবে কেন? আমি তো বুদ্ধিজীবী।’ সে কহিল, ‘আরে রাখো! শালবাড়িতে একশো দিনের কাজের তালিকায় কার

নাম নাই? প্যারা টিচার, সিভিক পুলিশ এমন কি হেড স্যারের নাম পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। সবাই শ্রমিক। এমন কি মালিকও।' শুনিয়া যে কী তৃপ্তি পাইলাম মামা! ভাষায় অপ্রকাশ্য। সবাই শ্রমিক হইবে... ইহাই তো ছিল স্বপন! তাই কহিতেছিলাম যে সাম্যবাদ থাকিলে তাহা...।

## ত্রিফলাটে

এসজেডিএ-র চেয়ার ম্যান নাকি হাসি হাসি মুখে কহিয়াছেন, ত্রিফলা লাটে? মানে, অনুপ্রেরণার আলোক বিচ্ছুরণকারী বাতিগুলির বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। এখন, ত্রিফলা বদলাইয়া এলইডি লাগাইতে হবে। তা ভালো কথা! কিন্তু শুনিয়াছিলাম এক পিস ত্রিফলার দাম নাকি হাজার সাতাশ পড়িয়াছিল! অধিকাংশই কয়েক হপ্তা জ্বলিবার পর খাবি খাইয়াছে। এইরূপ হইল কেন ভাই? বিজেপি বুঝি লোক লাগাইয়া বাল্ব ফিউজ করিয়া দিত? নাকি ত্রি ফলার নিজেদের মধ্য মারপিট করিয়া লাটে উঠিয়াছে? মনে হয় দ্বিতীয় কারণটিই ঠিক। নচেৎ, ত্রিফলা কী ভাবে লাটে উঠিল, সে বিষয়ে চেয়ার ম্যান নীরব থাকিবেন কেন?

## সুপার বিস্ময়

কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নন্টে-ফন্টে-কেল্টুদারা কী করিতেছে, তাহা সরেজমিনে জানিতে শীতের গভীর রাতে চুপি চুপি হানা দিয়াছিলেন সুপার। কিন্তু হিমেল হাওয়ায় ফিমেল ওয়ার্ডে প্রবেশ করিতেই একের পর এক বিস্ময়! ফিমেল ওয়ার্ডে এরা কারা? এ তো দেখিতছি 'ফি' হীন মেলের ছড়াছড়ি। তাহা হইলে কি সুপারের জেন্ডার চিনিতে ভুল হইল? মরণ! তাহা কেন হইবে! একটু পরেই সুপার বুঝিলন, মহিলা ওয়ার্ডে রীতিমত পুরুষতান্ত্রিক হইয়া গিয়াছে। পুরুষরাই সংখ্যাগুরু সেইখানে। খুব চিন্তিত হইয়া তিনি গমন করিলেন আরেক ওয়ার্ডে। বাহ! রোগি দেখিতেছি বেশ নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছে। কিন্তু রোগি কি জিনসের প্যান্ট আর সোয়েটার পরিয়া এত নিশ্চিন্তে ঘুমায়? ও আচ্ছা! সুপার বুঝিতে পারিলেন। রোগির সঙ্গে আসা পাব্লিক রোগির পাশের বেডে পরমানন্দে নিদ্রা যাইতেছে। কী কান্ড! তাহার পর অবশ্য বিস্ময়ের সুনামি কাটাইয়া সুপার কড়া কড়া নির্দেশ দিয়াছেন। তাহা কার্যকর হইয়াছে কি না জানা যায় নাই।

## টু হুইলারহস্য

পুলিশ কত্তা দলবল লইয়া একজনের বাটি খুঁজিতেছিল। সে ব্যাটা বউ নির্যাতনে করিয়া গায়েব হইয়াছে। কিন্তু এ গলি, সে গলি ঘুরিয়া পুলিশের কেবল গুলাইয়া যায়। অভিযুক্তের বাড়ি যেন গোলকধাঁধার মাঝে তস্করের ন্যায় লুকাইয়া আছে। শেষে কারা জানি কহিল, জনৈক ফ-বাবুর নিকট খোঁজ করিলে সে বাটির লোকেশান ঠিক ঠিক জানা যাইবে। ফ-বাবুর বাটি অবশ্য খুঁজিয়া পাইতে বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু সে বাটিতে প্রবেশ করিয়া পুলিশ দেখিল টু হুইলার। আহা! টু হুইলার কি এলিয়েন চালনা করে? তাহা কি নতুন জিনিস? বিপিএল হইলেও আজকাল টু হুইলার থাকে। কিন্তু পুলিশ কেবল টু হুইলার দেখিল না। দেখিল একত্রিশ খানি টু হুইলার সার দিয়া ফ-বাবুর বাটির আঙিনায় শীতের রোদ্দুর পোহাইতেছে। কিন্তু ফ-বাবুর তো দোকান নাই, গ্যারেজ নাই! তবে? মনে হয় চোরাকারবারি হবে! ভাবিতেই সকল হুইলার বাজেয়াপ্ত করিয়া ফেলিল পুলিশেরা। ফ-বাবু অবশ্যি বলিয়াছে, তিনি টু হুইলার জমা রাখিয়া টাকা ধার দিয়া থাকেন। কিন্তু এত সরলোক্তি পুলিশ মানিবে কেন? শিলিগুড়ির ঘটনা।

নোটবুকে আর কিছু লিখি নাই। উহা বন্ধ করিয়া সমিতির সদস্যগণকে জিগ্যাসা করিলাম, মিত্রোঁ! কিছু খবর দাও! খুচরা লিখিব। তাঁহারা সমস্বরে হৈ হৈ করিয়া প্রচুর কথা শুনাইল। কিছু কথা তুলিয়া দিলাম—

নৈরাশ্যবাদী প্রাবন্ধিক নাড়গোপাল ধর কহিলেন, 'ডুয়ার্সে লোকালয়ে চিতার হানা তুঙ্গে। চিতা লোকজন খাইতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া আমরাও কি জঙ্গলে চিতার গ্রামে হানা দিব?'

পঞ্চায়েত প্রধানের ব্যর্থপ্রেমিক ভাইপো কহিলেন, 'মেখলিগঞ্জের এক গাঁয়ের স্কুলের ক্লাশ গাছতলায় হইতেছে বলিয়া ভাবিবার কোনও কারণ নাই যে তাহা রাবীন্দ্রিক স্টাইল। ঘর না থাকিলে গাছতলাতেই থাকিতে হয়।'

বিষণ্ণ কমিউনিস্ট ছাত্রনেতা ব্রাত্যসারথি সরকার জানাইলেন, 'এনবিএসটিসি-র ড্রাইভারগণ নাকি বেতন না পাইয়া বাসাচলের হুমকি দিয়াছেন। বর্তমান গমেন্ট আমাদের ফের কপি করিল।'

ছোকরা কবি কবোষ্ণ বাগচি কহিলেন, 'ডুয়ার্সে বেশি আলুবাজি করিয়া কী লাভ যদি হিমঘর বাড়ন্ত হয়?'

আরও ছিল। সব বলিয়া কাজ কী? সব নিন্দা আমি একাই করিব যদি, পলিটিক্স চলিবে কী ভাবে? যাহা হউক, নিউজিক্যাল পোয়েট্রি লিখিবার দায়িত্ব কবি পুরন্দর ভাটকে দিয়াছিলাম। দেখা যাউক তিনি কী লিখিয়াছেন।

## পুরন্দর ভাটের অপ্রকাশিত কবিতা

১) লাটাগুড়ি রিসর্টে হইতেছিল বিয়া
আসিলেন গজপতি দন্ত বাগাইয়া।

২) এ কী হলো হায়
দিনের হাটায়
কৃষির ভবন
গড়ি নয়ন শোভন
খরচিয়া টাকা
উহা নাকি বাঁকা!

৩) চ্যাংড়াবান্ধায় বড়ো ধান্ধা যদি দেয় টাকা
বাঙলাদেশে যায় হেসে টেরাকের চাকা।

৪) মেচি আর বালাসন ফাঁকা হয় খালি
কারণ খারাপ লোক চুরি করে বালি।

৫) হে পরিযায়ী পাখি
মেলে আঁখি
এইবার ডুয়ার্সে আসিয়াছ কম
কোন সিনড্রম?

৬) আড়াইটি বৎসর পার হল গিয়া
পাহাড়েতে যান নাই আলুওয়ালিয়া।

৭) ট্রয় টিরেনের নতুন রাইড
পাব্লিক নাই হালুয়া টাইট।

**কলম সিং**

# ছড়রা

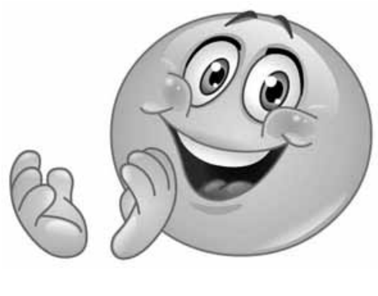

## আ মরি বাংলা

খাচ্ছি মোরা খাচ্ছি দ্যাখো
ইঞ্জিরিতে বাংলা
হুস্কি দিয়ে টুসকি লিয়ে
ঝালে ঝোলে হ্যাংলা?

দু পেগেতে বাংলা উধাও
হিন্দিমে তো বোলতা
এই বেয়ারা ইধার আওও
বোতল ক্যাসে খোলতা?

ট্যাটু পিঠে বারমুডা বাপ
দীঘার বীচে দিচ্ছে ঝাপ!
টাটু পিঠে মুটকি মম
দার্জিলিঙ্গে গিলছে কম?

বাংলা আখুন চালচুলোহীন
ইংলিশ মে ফুটছে খই
হ্যারি পটার মস্তি আনে
বর্ণমালায় সে আর কই?

বাংলা আমার মাতৃভাষা
খোল করতাল কীর্তন
বুঁদ করে দিক বাংলা নেশা
শমশান ঘাট যায় কোন?

**ধ্রুবজ্যোতি বাগচী**

*(ব্যঙ্গ ছড়া পাঠান। বিষয় সাম্প্রতিক সময়।*
*ইমেল: editor.ekhonduars@yahoo.com)*

গণতন্ত্রের ৭০: বিশেষ নিবন্ধ

# ধর্মের বেড়া ভেঙে যে সম্প্রীতির ইতিহাস পৌঁছয় নি সাধারণ ভারতবাসীর কাছে!

দেবপ্রসাদ রায়

ভারতবর্ষের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্কের সূত্রপাত ‘আক্রমণ’ দিয়ে না ‘আমন্ত্রণ’ দিয়ে? ইতিহাস বলছে আমন্ত্রণ দিয়ে। বাগদাদের সুলতান হারুন অল রসিদ রোগগ্রস্থ হলে যখন ইউনানি চিকিৎসায় তাঁর কোনও অবস্থার উন্নতি ঘটেনি, তখন ভারত থেকে ‘মনিকা’ নামে এক প্রখ্যাত আয়ুর্বেদ চিকিৎসককে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তাঁর চিকিৎসায় হারুন অল রসিদ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

তারপর থেকে আরব দুনিয়ায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং একের পর এক চিকিৎসককে বাগদাদে আমন্ত্রণ জানানো হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত খলিফা মুয়াইয়ার সময়ে সিরিয়া ও খাসগারে ভারতীয় চিকিৎসক ও রাজ কর্মচারীদের কলোনিও গড়ে ওঠে।

৭১২ সালে পাঞ্জাব ও সিন্ধু যদিও মহম্মদ বিন কাসিমের দ্বারা আক্রান্ত হয়; ইসলাম এ দেশে প্রবেশ করেছে অন্য পথে। উত্তর কেরালার কোড়ুঙ্গালুরে মালিক বিন দিনারের নেতৃত্বে ইসলামে বিশ্বাসী যে আরবকূল এসে বসবাস শুরু করেন রাস্ট্রকূট বংশের রাজারা তাদের শুধু সাদরে গ্রহণ করেন নি, ধর্মপ্রচার করার অবাধ অধিকার দিতেও কার্পণ্য দেখান নি। ভারতীয় রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় তাই প্রথম মসজিদ গড়ে ওঠে দক্ষিণ ভারতে।

‘সহাবস্থান’ যে ‘সংঘাতের’ চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তারকারী তার প্রমাণ, সুলতান মহমুদ যেখান দিয়ে ১০২৪ সাল থেকে ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেছে, সেই উত্তর-পশ্চিম ভারতে (রাজস্থানে) মুসলমানের উপস্থিতি মাত্র ৬ শতাংশ, আর দক্ষিণ ভারতে কেরালায়, যেখানে ইসলাম এসেছে আরব বণিকদের হাত ধরে, সেখানে মুসলমানদের উপস্থিতি ২১ শতাংশ।

উত্তর ভারতে বার বার মুসলিম আক্রমণ হয়েছে, সুলতানি শাসন কায়েম হয়েছে, হিন্দুরা আক্রান্ত হয়েছে, তবুও সামাজিক স্তরে হিন্দু ধর্ম ও ইসলামকে পরস্পরের কাছাকাছি করার প্রয়াস কখনও থেমে থাকেনি। রামানন্দ, তুকারাম, কবির, নানক প্রমুখ উদারপন্থী ধর্মপ্রচারকেরা তাঁদের দর্শনের মাধ্যমে বার বার এটাই বলতে চেয়েছেন, হিন্দু ধর্ম ও ইসলামের আবেদনে কোনও মৌলিক তফাৎ নেই। তাই শাসন কর্তারা কখনও কখনও সংঘাতের পথ নিলেও সামাজিক স্তরে দুই ধর্মের উপর একটা সমন্বয় সাধনের স্রোত বরাবরই প্রবাহিত হয়েছে।

প্রচলিত ইতিহাসে সংঘাতের চেহারাও তুলে ধরার ক্ষেত্রে সবসময় ইতিহাসের প্রতি সুবিচার করা হয়নি। হলদিঘাটের যুদ্ধে রাণা প্রতাপ আকবরের কাছে পরাস্ত হন বলে আমরা সবাই জেনেছি। কিন্তু আকবরকে সেই যুদ্ধে জয়লাভ করতে রাণা প্রতাপের বিশ্বস্ত সেনাপতি হাকিম শুরের মৃতদেহের উপর দিয়ে প্রবেশ করতে

**আমার দেশের বৌদ্ধ ধর্ম যদি দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের ধর্ম হতে পারে, তবে ইসলাম বাইরের থেকে এলেও আমার দেশের মানুষের নিজের ধর্ম হিসাবে নিশ্চয়ই স্বীকৃতি পাওয়ার দাবি রাখে। তাই যখন গোধরার অম্বিলায়, নারোরা পাটিয়া, বেস্ট বেকারী বা বিলকিস মামলার মত শাসনযন্ত্রের প্রশ্রয়ে সংখ্যালঘুদের নিধন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তখন দেশের গণতন্ত্রের মূল ভিতটাই নড়ে ওঠে।**

হয়েছিল, ইতিহাস এই তথ্যটা আমাদের জানাবার আগ্রহ দেখায়নি।

ছত্রপতি শিবাজিকে আফজল খাঁ হত্যা করতে চেয়েছিলেন, আমরা ইতিহাসে পড়েছি, কিন্তু শিবাজীর প্রধানমন্ত্রী হায়দার আলি তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত পার্শ্বচর ছিলেন, তা জানাতে প্রচলিত ইতিহাস কখনও সোচ্চার হয়নি।

বাবর মন্দির ভেঙে মসজিদ বানিয়েছিলেন বলে একটা বিতর্কিত বিষয় আমাদের জানানো হয়েছে, কিন্তু হনুমান ঘড়ি কোনও সময়ে মসজিদ ছিল, এই অভিযোগে মুসলমানরা হনুমান ঘড়ি আক্রমণ করলে অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ তা প্রতিহত করেছিলেন এ তথ্য ইতিহাস আমাদের জানাতে কার্পণ্য করেছে। ঔরঙ্গজেব ‘ধর্মান্ধ’ ছিলেন আমরা সবাই জানি। তার হিন্দু ধর্ম বিরোধী আচরণের অনেক বর্ণনাও আমরা পাই। কিন্তু একটা বিষয় জানানো এক্ষেত্রে আমার কর্তব্য। প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস রচয়িতা শ্রী বিশ্বম্ভর নাথ পান্ডে যখন এলাহাবাদের মেয়র ছিলেন, তখন তিনি পুরনো কাগজ-পত্র বাছতে গিয়ে একটি ফারসী ভাষায় লেখা ফরমান পান। তিনি নিজে ফারসী জানতেন না বলে, সে ভাষায় পণ্ডিত তেগ বাহাদুর সপ্রুর কাছে ফরমানটি নিয়ে যান। তেগ বাহাদুর সাহেব ফরমানটি পাঠোদ্ধার করে শ্রী পান্ডেকে জানান যে এইটি ঔরঙ্গজেবের ফরমান। এতে খান্ডোয়ার ওঙ্কারেশ্বর সহ ছ’টি শিবমন্দিরকে ভূমিদানের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই অন্য ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে আমাদের প্রজন্ম পরিচিত হওয়ার কোনও সুযোগ পেল না।

মোগল শাসনের অবসানে ব্রিটিশ শাসন এসেছে, কিন্তু খ্রিস্ট ধর্ম এসেছে তারও অনেক আগে। যিশু খ্রিস্টের প্রত্যক্ষ শিষ্য সেন্ট টমাস দক্ষিণ ভারতে ২০ বছর ধরে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করে ৫৮ সালে কোচিনে দেহত্যাগ করেন। সেখানে আজও তার সমাধি অটুট আছে।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজদণ্ড হাতে তুলে নেয়, আর ১৭৬৯ সালে তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে উত্তরবঙ্গে। ভবানী পাঠক ও মজনু শাহের যৌথ নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এই আন্দোলন সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ বলে খ্যাত। এই আন্দোলন হিন্দু ও মুসলমানকে একযোগে রণাঙ্গনে নিয়ে আসে ও ১৮০০ সাল পর্যন্ত এ লড়াই অব্যাহত থাকে। লেনন, ম্যাকেঞ্জি ও রেনান— তিন ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ এই বিদ্রোহে প্রাণ বিসর্জন দেয় এবং অবিভক্ত বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই বিদ্রোহের প্রভাব পড়ে। ইতিহাসবিদদের বক্তব্য, সামাজিক স্তরে ‘সুফিজিম’ এর প্রভাব এত গভীর ছিল যে, ধর্মের বাধা নিষেধকে উপেক্ষা করে এই আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলমান একত্রিত হতে কোনও ইতস্তত বোধ করে নি।

ওয়াহবী আন্দোলন স্বাধীনতার যুদ্ধের আরেকটি স্বল্পোচ্চারিত অধ্যায়। ১৮২২ সাল থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত মৌলানা ও মৌলবিদের দ্বারা পরিচালিত এই আন্দোলন সৈন্য শিবিরগুলিতে গোপনে যে বীজ বপন করেছিল, বিশেষত উত্তর ভারতের মালদা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত, তার ফলশ্রুতিতে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ জন্ম নেয়। আরও আগে ১৮৩২ সালে নারকেলবেড়িয়ার তিতুমীর নামে যে মানুষটি বাঁশের কেল্লা বানিয়ে তিন দিন প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তার পর প্রাণ বিসর্জন দেয়, সেও ওয়াহবী আন্দোলনের ফসল। তাঁর প্রকৃত নাম যে মির নিশার আলি— এ তথ্য ইতিহাস জানাতে আগ্রহ দেখায়নি।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনটি পর্বে তিনজন ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, যারা তিনজনই ছিলেন মুসলমান। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্বে বাহাদুর শাহ জাফর। স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রথম দ্বীপান্তর, মৌলবী আলাউদ্দিন। স্বাধীনতার পর প্রথম পাক-ভারত যুদ্ধে জম্মুর নৌসেরার প্রাঙ্গণে প্রথম শহীদ ব্রিগেডিয়ার ওসমান।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস তাই প্রমাণ করে এ দেশে সর্বধর্মের লোক প্রাণ বিসর্জনের ভেতর দিয়ে, বলিদানের ভেতর দিয়ে এ দেশের মূলস্রোতে নিজের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই কাউকেই মূল স্রোতের বাইরে রাখবার কোনও বিশেষ অধিকার কারোর নেই। ইসলাম নিশ্চয়ই বাইরে থেকে এসেছে। কিন্তু মুসলমান এ দেশেই জন্মেছে। ১৯৫৫ সালে সংসদে এক বিতর্কের উত্তরে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বলেছিলেন 'Christianity in India is as old as the

religion itself…'

ভারতবর্ষে একবার থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রপ্রধান এসেছিলেন তার পবিত্র তীর্থস্থান বোধগয়াতে। বিহারের রাজ্যপাল পাটনা থেকে তার সঙ্গে ছিলেন। তিনি বোধগয়া পরিদর্শন করে রাজ্যপাল সফি কুরাশীকে বলেন— 'এটা সত্যি আশ্চর্যের! যে দেশে বৌদ্ধ ধর্ম জন্মেছে আজ সেখানে তা প্রায় বিলীন, আর আমরা দক্ষিণ এশিয়ার কোটি কোটি লোক এই ধর্মকে আঁকড়ে রেখেছি।' উত্তরে সফি কুরেশী বলেছিলেন, 'ধর্ম আমাদের কাছে সূর্যের মত। যখন পশ্চিম দিকে অস্ত যায় তখন পূর্ব দিকে উদিত হয়। আজ বৌদ্ধ ধর্ম আমাদের দেশে অস্ত গেছে বলেই তোমার দেশে উদিত হয়েছে।' আমার দেশের বৌদ্ধ ধর্ম যদি দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের ধর্ম হতে পারে, তবে ইসলাম বাইরের থেকে এলেও আমার দেশের মানুষের নিজের ধর্ম হিসাবে নিশ্চয়ই স্বীকৃতি পাওয়ার দাবি রাখে। তাই যখন গোধরার অছিলায়, নারোরা পাটিয়া, বেস্ট বেকারী বা বিলকিস মামলার মত শাসনযন্ত্রের প্রশ্রয়ে সংখ্যালঘুদের নিধন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তখন দেশের গণতন্ত্রের মূল ভিতটাই নড়ে ওঠে।

সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হিন্দু ভাবাবেগকে উস্কে দিতে নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে 'গর্ব সে কহো হাম হিন্দু হ্যায়'! দেশের ৮৩ শতাংশ হওয়ার পরও তোমাকে বার বার জানাতে হবে কেন, তুমি কে? যাঁকে জানাতে চাইছ, এন.এস.এস.ও সার্ভে বলছে তাঁরা সংখ্যালঘুরা— শিক্ষায়, ভূমি মালিকানার ক্ষেত্রে, বেকারত্বের হারের ক্ষেত্রে সব বিষয়েই সংখ্যাগরিষ্ঠের চেয়ে পিছিয়ে। তাকে বার বার ভয় দেখিয়ে কী লাভ হচ্ছে? যত তাদের ভয় দেখানো হবে, ততই তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে আর হয়ত কখনও কখনও বাঁচার প্রয়োজনেই দেশের বাইরে তাকাতে চাইবে!

তবুও তালিবানি শাসনের অবসানে, আফগানিস্তানে যত আল-কায়দার জঙ্গী ধরা পড়েছে, তাঁতে আফগান আছে, চেচেন আছে, উজবেক আছে, ফিলিপিনো আছে, কিন্তু একজন ভারতীয়কেও পাওয়া যায়নি বরং সেনাবাহিনী থেকে তারিফকে যখন নিখোঁজ বলে প্রায় অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়, তখন সে পাকিস্তানের জেল থেকে বাড়ি ফিরে আসে, প্রমাণ করে, সে পালায় নি, দেশের জন্য বিদেশের কারাগারে পড়ে থেকেছে।

এদেশের দুর্ভাগ্য, যে গৈরিক রং যুগে যুগে ত্যাগের প্রতীক হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে, আজ তা, মৌলবাদের প্রতীক হিসাবে পরিণত হয়েছে। তাই সাম্প্রতিককালের

**'গর্ব সে কহো হাম হিন্দু হ্যায়'! দেশের ৮৩ শতাংশ হওয়ার পরও তোমাকে বার বার জানাতে হবে কেন, তুমি কে? যাঁকে জানাতে চাইছ, এন.এস.এস.ও সার্ভে বলছে তাঁরা সংখ্যালঘুরা— শিক্ষায়, ভূমি মালিকানার ক্ষেত্রে, বেকারত্বের হারের ক্ষেত্রে সব বিষয়েই সংখ্যাগরিষ্ঠের চেয়ে পিছিয়ে। তাকে বার বার ভয় দেখিয়ে কী লাভ হচ্ছে? যত তাদের ভয় দেখানো হবে, ততই তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে আর হয়ত কখনও কখনও বাঁচার প্রয়োজনেই দেশের বাইরে তাকাতে চাইবে!**

'তেরঙ্গা যাত্রার' পতাকার তিন রং প্রতীকী চেহারা নিয়ে থেকে গিয়েছে, পরিধানের 'গৈরিক' রং মুখ্য হয়ে উঠেছে।

যে দেশে হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের মত অসংখ্য মাজারে প্রতি উৎসবে হিন্দু-মুসলমান একত্রিত হয়, রাজগঞ্জে রফি-বাপীরা একত্রে পুজোর আয়োজন করে, সে দেশে মৌলবাদ কখনও শেষ কথা বলতে পারে না।

বরং তাদের দিকে তাকিয়ে কবিগুরুর ভাষায় বলতে হয়—

'ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।

বিধর্ম বলি মারে পর ধর্মেরে,
নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে,
পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে,
আচার লইয়া বিচার নাহিকো জানে,
পূজাগৃহে তোলে রক্তমাখানো ধ্বজা—
দেবতার নামে এ যে শয়তান ভজা।'

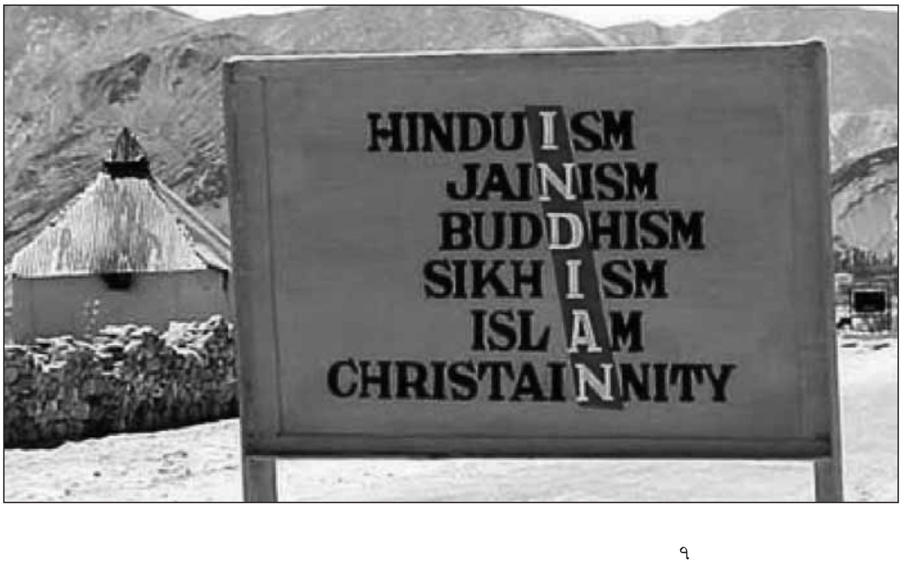


এখন ডুয়ার্স

'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার
পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে

# বিশেষ
# শ্রীমতি ডুয়ার্স সংখ্যা

**গত পাঁচ বছরে প্রকাশিত**
**বাছাই শ্রীমতিদের ছবিসহ প্রতিবেদন**

## ডুয়ার্সের সেরা শ্রীমতীরা

**ডুয়ার্সের একমাত্র নারী বিধায়ক**
**মিতালি রায়-এর**

## ডুয়ার্সের মেয়েবেলা

**রাখি পুরকায়স্থ-র বিশেষ প্রতিবেদন**

## শ্রীমতির চোখে শ্রীমতি

**মৃগাঙ্ক চক্রবর্তীর প্রতিবেদন**

## ডুয়ার্সের নারী পূজা

**সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য-র বড়গল্প**

# রাজন্যা

এছাড়া থাকছে অন্যান্য নিয়মিত
কলম ও ধারাবাহিক কাহিনি

**প্রকাশিত হবে ৮ মার্চের আগেই।**

**এই মূল্যবান সংকলনটি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না**

**দাম ২০ টাকা**

একুশে ফেব্রুয়ারি বিশেষ প্রতিবেদন

# ওপারে লালন ও পালন এপারে কেবল মন্ত্রোচ্চারণ

তনুশ্রী পাল

**পৃথিবীর বহু দেশের লেখাপড়া জানা মানুষ আজও জানেনই না বাংলাদেশ ছাড়া ভারতেও বহু মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। জানলে তাঁরা খানিক বিস্মিত হন বইকি। তাঁদের এই অজ্ঞতার জন্য দায়ী কি আমরা নিজেরাই অর্থাৎ ভারতীয় বাংলাভাষীরাই নই? যাঁরা বাংলা ভাষার বিপন্নতার কারণ হিসেবে চোখ বুঁজে হিন্দি আগ্রাসনকে দায়ী করেন! যাঁদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে বাংলাকে সেকেন্ড বা থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে রেখে আত্মগরিমা অনুভব করেন! যাঁদের গিন্নিরা হিন্দি টানে বাংলা উচ্চারণে নিজেদের ধনী বা এলিট সোসাইটির প্রতিনিধি হিসেবে জাহির করেন! হিন্দি মোড়কে পোরা বাংলা সিরিয়ালের জনপ্রিয়তা কিংবা মুম্বই সঙ্গীত শিল্পে বাঙালীর আধিপত্য কি বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতে পারছে এপারে? ওপারের প্রাণের ভাষা বাংলা এপারে মান ইজ্জত খুইয়ে বিপন্ন, অন্ত্যজ ভাষা! তাই ওপারের মাতৃভাষা দিবস ২১ফেব্রুয়ারি আমাদের এপারে পালন করা কি আদৌ শোভা পায়?**

মাতৃভাষা হারিয়ে গেলে জাতিসত্ত্বাটিও ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। এই পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে, হয়ে যাচ্ছে কত ভাষা ও কত জাতি। 'পিপলস লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া অধীনে সমীক্ষা চালিয়ে বিভিন্ন রিপোর্ট তৈরি হচ্ছে; সেখানে বলা হয়েছে, দেশে এখন জীবিত ভাষার সংখ্যা ৭৮০, অথচ বছর কুড়ি আগে ২০০১-এ ভাষার সংখ্যা ছিল ১,৬৩৬টি। যা উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ বইকি! ২০১৯ সালকে রাষ্ট্রসংঘের আঞ্চলিক ও দেশীয় ভাষার বছর হিসেবে ঘোষণা সেই উদ্বেগেরই প্রতিফলন বলা যায়!

দ্বিখণ্ডিত ভারত ছেড়ে বিদায় নিল ইংরেজ। হল হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান। উর্দুভাষী পশ্চিম পাকিস্তান এরপর বাংলাভাষী পূর্ব পাকিস্তানের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইল বাংলার পরিবর্তে উর্দু ভাষা জোর করেই। বন্দুকের নল ও বারুদের শাসনে কল্লোলিনী বাংলাভাষাকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল তারা। বাংলাদেশ যার নাম, বাংলা তাদের রাষ্ট্রভাষা। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নতুন করে বাঙালি জাতিসত্ত্বার পুনর্জাগরণ ঘটে ও সেই পথ ধরেই ১৯৭১-এ রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রটির জন্ম হয়। অর্থাৎ মাতৃভাষা ব্যবহারের অধিকার সে দেশের মানুষকে রক্তের ও প্রাণের বিনিময়ে অর্জন করে নিতে হয়েছিল; আবার হাজার হাজার মানুষের প্রাণের বিনিময়েই 'বাংলাদেশ' নামক নতুন রাষ্ট্র নির্মাণ করেছেন ওপারের বাঙালিরা। সবই তাদের অর্জন করতে হয়েছে কঠিন সংগ্রামের বিনিময়ে। সেখানে সর্বত্রই বাংলারই চর্চা। রেল, বাস, বিমানের টিকিটে বা স্থান নামে; দোকান-বাজারের সাইনবোর্ডে, গাড়ি বা বাইকের নম্বরে বাংলা অক্ষর ও সংখ্যা জ্বলজ্বল করছে।

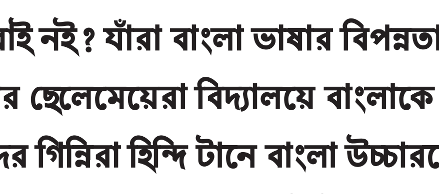


দিব্যি চলছে একটা গোটা দেশে সার্বিক ব্যবস্থা, বাংলাভাষার মাধ্যমে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়কে বাংলার মাধ্যমে বাহিত করছে ওপার বাংলা। কম্পিউটারের জন্য বাংলায় ইউনিকোড ফন্ট প্রবর্তন করেছেন তাঁরা, বিশ্বের বাংলাভাষী মানুষকে ইন্টারনেটে একাত্মীকরণের বিপ্লব ঘটে গিয়েছে নিঃশব্দে। সমকালের পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে বাংলাভাষার নানাবিধ অভিযাত্রায় বাংলাদেশ পথ-প্রদর্শক। বাংলা ভাষামাতৃকাকে আক্ষরিক অর্থেই হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়ে সম্মান দিচ্ছে বাংলাদেশ।

অপরপক্ষে বহু ভাষাভাষীর দেশ আমাদের প্রিয় ভারতবর্ষ, বিভিন্ন রাজ্যের— ভাষা, খাদ্যাভাস, পোশাক-আশাক, চেহারা, প্রাকৃতিক পরিবেশ পৃথক। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটিও কম বড় নয়; এ রাজ্যে বাংলাই মুখ্য ভাষা, এই বিষয়টিও সকলেই জ্ঞাত আছেন। পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী মানুষের সংখ্যা ৯৬.৬৪ শতাংশ, বাংলাভাষার চর্চাও স্বাভাবিকভাবেই হয়, কিন্তু আজ পারিপার্শ্বের দিকে চেয়ে কেমন এক বেদনাবোধ ও শঙ্কা অনুভূত হয়। আজ আমাদের এ রাজ্যে বাংলাভাষার অবস্থানটি খুব আশাপ্রদ নয় বলেই মনে করি। শুধু তাই নয়; এপার বাংলায় বাংলাভাষা সঙ্কটাপন্ন, বিপন্ন, তার ভুরি ভুরি উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে। এপারে মাতৃভাষার প্রতি, আমাদের বাংলাভাষার প্রতি প্রীতিবোধ বা ভালবাসা বা শ্রদ্ধাবোধ ক্রমেই ক্ষীয়মাণ। এ বাংলায় এক শ্রেণির মানুষ তার মাতৃভাষা বাংলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে হীনমন্যতাবোধে ভোগেন। মধ্যবিত্ত বাঙালি সন্তানকে ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে পড়াতে না পারলে লজ্জিত হন।

'একুশের চেতনা' বা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটি নিয়ে ঠিক কতখানি গভীর আবেগে আলোকিত হয় এপার বাংলার সার্বিক হৃদয়, সে বিষয়ে তাই যথেষ্ট সন্দেহ আছে। একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্নের সামনেই যেন বা দাঁড়িয়ে আছি— কী হবে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের

মাতৃভাষা বাংলার? সযত্ন চর্চার অভাবে কি এ ভাষা হারিয়ে যাবে আর ভাষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি জাতিসত্তাটিও?

উত্তরের সন্ধানে আসুন 'মাতৃভাষা' শব্দটির কাছেই ফিরি। মাতৃভাষা অর্থাৎ মায়ের বা মাতৃস্থানীয় কারও মুখ থেকেই শিশু যে ভাষা প্রথম শেখে। তাহলে পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে সঙ্গে মায়েদের কাঁধে বিরাট এক গুরুদায়িত্ব বর্তায়— অত্যন্ত শ্রদ্ধায় ও ভালবাসায় অন্তরের প্রীতির সঙ্গে শিশু যেন তার মাতৃভাষাটির শেখে। শেখাবেন মাতৃস্থানীয়রাই।

বাংলাভাষার বিপুল বিশাল শিশু-সাহিত্যের জগত রয়েছে, তার সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেবেন মা বা মাতৃস্থানীয়রা। যে মাধ্যমের বিদ্যালয়েই সে পড়ুক, অন্যান্য ভাষাশিক্ষার সঙ্গে আপন মাতৃভাষা বাংলাতেও শিশু দক্ষ হয়ে উঠুক। বাঙালি জাতিসত্ত্ব সম্পর্কে সচেতন হোক। আমরা যারা লেখালেখির চেষ্টা করি তাঁরাও বাংলা ব্যাকরণের মান্যতা দিতে সচেষ্ট হই, বানানশুদ্ধির জায়গা থেকেই তাঁদের কর্ম সম্পাদন করুন। খিচুড়ি ভাষায় সংবাদ পরিবেশন বা সঞ্চালনার কর্মটি বন্ধ হওয়া দরকার অতি সত্বর। সরকারি কার্যালয়গুলিতে বাংলার শুদ্ধ বানানে নামাঙ্কন করা হোক, হিন্দি বা ইংরাজি থাকলে থাকুক সেই সঙ্গে। স্টেশন, দোকান, বাজার, গাড়ির নম্বর সব বাংলাতেই লেখা হোক আমাদের পশ্চিমবঙ্গে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণকালে আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন এত বেশি ইংরাজির ব্যবহার সেখানে সর্বত্র নেই। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই সম্ভবত একমাত্র রাজ্য যেখানে অন্য ভাষার বিদ্যালয়গুলিতে স্থানীয় ভাষা বাংলাভাষা অন্তত অষ্টম মান পর্যন্ত পঠন-পাঠন বাধ্যতামূলক নয়। ভারতের অন্যান্য সব রাজ্যে কিন্তু বাধ্যতামূলক হয়েছে স্থানীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়টি। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ভ্রমণকালে আরও কিছু বিষয় চোখ টেনেছে— অফিস-আদালত, দোকান-পাট, বাস বা রেলওয়ে, গাড়ির নম্বর সবেই রাজ্যের নিজস্ব ভাষার প্রাধান্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তার অন্যথা আমাদের আত্মবিশ্বাসের অভাবকেই প্রকট করে তোলে, নয় কি?

বাংলা ভাষার বয়স তো কম নয়; এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন 'চর্যাপদের' সময় থেকেও যদি হিসাব করি তবে তো হাজার বছর পার করেছে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। বয়সে প্রাচীন, মিষ্টি-মধুর অনন্ত সম্পদশালিনী আমাদের এই বাংলা ভাষাকে ইংরাজির মতই নানা ভাষা থেকে আসা স্রোত সমৃদ্ধ করেছে। ভাষাকে আমরা ভালবাসি, গান বাঁধি, গল্প-উপন্যাস লিখি; নির্মাণ করি চলচ্চিত্র, নাটক— বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে এ সকল মাধ্যম নিয়ে। কিন্তু ভাষার প্রতি দায়বদ্ধতায় বা সযত্ন লালনের ক্ষেত্রে আমরা এপার বাংলার ভারতীয়রা যে পিছিয়ে তার প্রমাণ আমরা বারবার দিয়ে চলেছি।

কবি শামসুর রাহমান তাঁর 'বাংলাভাষা উচ্চারিত হলে' কবিতায় অসাধারণ পংক্তি উচ্চারণ করেছেন, "বাংলাভাষা উচ্চারিত হলে নিকানো উঠোনে ঝরে রোদ" কখনও 'জ্যোৎস্নার চন্দনের' মত নরম ও নির্মল মনে হয়েছে কবির বাংলাভাষাকে। এই কবি 'বর্ণমালা, আমার দুখিনী বর্ণমালা' কবিতায় একবার বলছেন, 'নক্ষত্রপুঞ্জের মত জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছ আমার সত্ত্বায়' আবার এই কবিতার শেষ অংশে, বাংলাভাষার প্রতি মানুষের অবহেলা দেখে ব্যথিতচিত্তে ক্ষোভের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন—

'এখন তোমাকে নিয়ে খেঙরার নোংরামি
এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি খেউরের পৌষমাস।'

অপশব্দের ব্যবহারে নতুন প্রজন্ম অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। পথে ঘাটে কান খোলা রাখলে শোনা যাচ্ছে কী অবলীলায় মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে অপশব্দগুলি, সে সব শব্দ শ্রবণে ব্যথিত হচ্ছে হৃদয়। এ বড় দুঃখের সময়। এত অবহেলা বা 'খেঙরার নোংরামি' প্রাপ্য কি আমাদের ভাষা-মাতৃকার? সচেতন হতে হবে বাংলাভাষী সকল সন্তানকে, আর অবহেলা নয়, যোগ্য সম্মান দিয়ে মাকে ধারণ করতে হবে অন্তরে। সমকালের প্রয়োজনে ভাষাকে সমৃদ্ধ করে নিতে হবে উপযুক্ত অনুবাদে, পরিভাষা ব্যবহারে।

যে বাংলাভাষার জন্য বুকের রক্ত ঢেলেছেন ভাষা শহিদেরা, যে মাতৃভাষা বাংলার জন্য আবেগে উত্তাল হয় ওপার বাংলা, এপারে কিন্তু তেমনটি নয়। 'একুশের চেতনা' বলে একটি গভীর আবেগজাত শব্দ ওপারে মানুষের হৃদয়কন্দরে শিকড় ছড়িয়ে অবস্থান করে। ওপারের মানুষের প্রচেষ্টায় ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিশ্বের ১৮৯টি দেশ, এই দিনটি পরমশ্রদ্ধায় উদ্‌যাপন করবে। এপারে আমরাও করব অবশ্যই। কিন্তু শুধু দিবস উদ্‌যাপন করে আত্মতুষ্টির আনন্দ পাওয়া গেলেও ভাষার প্রতি মমতা ও শ্রদ্ধার অবকাশ কিন্তু তৈরি হয় না। আসলে এপারে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত মাতৃভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা তেমন কোনও বাধার সম্মুখীন হইনি এ যাবৎ। তাই হয়ত অনায়াসলব্ধ 'ধন' অর্থাৎ মাতৃভাষার জন্য বা তার সযত্ন ব্যবহারের দিকে আমরা লক্ষ্য রাখিনি; ভাষার মলিন মুখ, মলিন বসন দেখেও আমরা না দেখার ভান করছি। এপারে ফেব্রুয়ারির 'একুশে' তাই আর পাঁচটা অনুষ্ঠানের মতই যেন একটি অনুষ্ঠানমাত্র।

# ভূকম্পের এপিসেন্টার এবার কি বাংলা ?

জয়ন্ত গুহ

### এ কঠিন লড়াইয়ের মোকাবিলা কীভাবে সম্ভব মোদি-অমিতজী ?

শিবঠাকুরের আপন দেশে ভোটের বাদ্যি টাকডুমাডুম... এই লাইনটাই বারবার মাথায় আসছে। অথচ লিখতে বসেছি সাং-ঘা-তি-ক একটা সিরিয়াস বিষয় নিয়ে। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন এবং দেশজুড়ে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী কৌশল। এখনও পর্যন্ত মোদিবিরোধী পাঁচটি জোট হয়েছে, আরও হতে পারে অথবা ঘোষিত পাঁচটি জোট নতুন রূপ নিতে পারে কিন্তু প্রধান ইস্যু একটাই থাকবে, "মোদি হটাও, দেশ বাঁচাও"। গত পাঁচ বছরে পরিকাঠামো, আইন-শৃঙ্খলা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উন্নয়ন এবং গ্রামে বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে সাফল্যের পাশাপাশি কৃষি, শিল্প, বিদেশনীতি এবং কর্মসংস্থানে মোদির ব্যর্থতা থাকলেও দুটি ক্ষেত্রে পরিকল্পনামাফিক আরএসএস-বিজেপি চূড়ান্ত সফল। প্রথমত রাহুল গান্ধিকে প্রায় প্রতিদিন আক্রমণ অর্থাৎ গুরুত্ব দিতে দিতে রাহুলের মধ্যেই প্রতিস্থাপিত করা প্রধান বিরোধী নেতার ইমেজ। যেটা মমতা বা মায়াবতী হলে বিজেপির কাছে ভয়ের কারণ হতে পারত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রিত্বের দৌড়ে রাহুল যিনি আজ পর্যন্ত কোনও নির্বাচনেই জেতেন নি তাঁর সঙ্গে মোদির তুলনা হলে সবসময়ই এগিয়ে থাকবে মোদি। দ্বিতীয়ত আরএসএস-বিজেপির তৈরি করা রাহুলের "লার্জার দ্যান লাইফ" ইমেজ কংগ্রেস গিলে নিলেও কগ্রেসের ছাতার তলায় রাহুলের নেতৃত্ব মানতে নারাজ মমতা, মায়াবতী, অখিলেশ, কেজরিওয়াল। কুলহারা তেজস্বী যাদব বিহারে রাহুলের সঙ্গে। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসহীন বুয়া ভাতিজার সঙ্গে। আর বাংলায় ২৩ পার্টির সংহতি মঞ্চে যাদের কোনও প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নেই কিন্তু ছায়ানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় মায়াবতীর মতই একটি ব্র্যান্ড এবং রাহুলের নেতৃত্বে তিনি চলবেন না। পাশাপাশি, ইস্যুর ভিত্তিতে সমর্থন থাকলেও মমতা-মায়াবতীর নেতৃত্বে চলবেন না রাহুল। গান্ধি পরিবারে জন্মে প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান বিরোধী নেতা হওয়া যায় কিন্তু 'ফলোয়ার' হওয়া যায় না। রাজত্ব যায় যাক কিন্তু রাজার পোশাক, রাজপ্রাসাদ এবং রাজকীয় মেজাজ যেন অটুট থাকে। "গান্ধি পরিবার ছাড়া আসমুদ্র হিমাচল কংগ্রেস কর্মীদের একজোট করা যায় না" এবং এর বাইরে কোনও ধারণা কংগ্রেসের প্রবীণ সম্মানীয় নেতা নটবর সিং, প্রণব মুখার্জি এবং পিভি নরসিমহা রাও-রা কোনওদিন দেওয়ার চেষ্টা করেন নি।

### ভোটের অঙ্ক ছাপিয়ে যাবে রসায়ন ?

কিন্তু তাঁর মানে এই নয় যে বিজেপি নির্ভয়ে টাকডুমাডুম ঢোল বাজাতে পারে। ২০০২-এর পর থেকে এখনো পর্যন্ত মোদি কোনও নির্বাচন হারেন নি কিন্তু ২০১৯-এর নির্বাচন তাঁর জীবনের অন্যতম কঠিন লড়াই। তিনি ভাল করেই জানেন ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের অভুতপূর্ব ফলাফল পুনরায় ঘটবে না। এককভাবে ২৮২ আসন বিজেপি পাবে না। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে শিবসেনার ১৮টি আসন নিয়ে ১১২টি আসন প্রাপ্তির পুনরাবৃত্তি এবার ঘটবে না। নির্বাচন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ৮০ আসনের উত্তরপ্রদেশ লোকসভায় এবার বুয়া-ভাতিজা জোট পেতে পারে ৪১টি আসন, বিজেপি ৩৭ এবং ২টি আসন কংগ্রেস। জোটে কগ্রেস থাকলে জোটের মোট আসন হতে পারত ৫৭টি কিন্তু সেক্ষেত্রে বুয়া-ভাতিজার ভাগ থেকে অন্তত ১০-১২ টি আসন ছাড়তে হত কংগ্রেসকে। যা ছাড়তে নারাজ সপা-বসপা। রাজস্থান,মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিসগড়ে ২০১৪-র মোদি হাওয়া স্তিমিত। সেবার তিন রাজ্যে বিজেপি জিতেছিল ৬২টি আসন। এবার হারাতে পারে ৩২টি আসন। অনুমান করা যায়, ক্ষতির পরিমান ১৫-২০টি আসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে জান বাজি রেখে রণক্ষেত্রে নামবে বিজেপি — যদি শেষরক্ষা হয়। গুজরাটের ২৬টি লোকসভা আসন বিজেপির দখলে থাকলেও ২০১৭-র বিধানসভা নির্বাচনে দমবন্ধ করা লড়াই দিয়েছিল কংগ্রেস। ১৮২ আসনের গুজরাট বিধানসভায় ৯৯-এ আটকে থাকা বিজেপি, খাতা খুলতে পারেনি মোরবি, আমরেলি এবং গির সোমনাথ জেলায়। ২৮টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১৭টি আসন পেয়েও কর্নাটক বিজেপির হাত থেকে ফসকেছে, লোকসভায় নিঃসন্দেহে বিজেপিকে টক্কর দেবে কংগ্রেস-জেডিএস জোট। এসব কিছু বিলক্ষণ জানেন শাহ-মোদি। এবং তাঁরা এটাও জানেন এককভাবে ২৫০-২৫৩র বেশি আসন বিজেপি পাবে না। সম্ভবত ৮০-১০০টি আসন হারাবে বিজেপি কিন্তু তবু তাঁরা বলছেন "ফির একবার। মোদি সরকার"। কীভাবে হবে সেটা সম্ভব। অঙ্কটা কী ?

ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ যেখানে রাজনীতিতে অসম্ভব বলে কোন শব্দ নেই। ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে মাত্র ৪৪টি আসন পেয়ে ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের আগে সংসদ ও সংসদের বাইরে মোদিকে রীতিমতো চোখ রাঙাতে পারে রাহুল, একথা কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল ! ১৯৭১-এ ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল এককাট্টা হয়ে যায় কিন্তু জিতে যান ইন্দিরা গান্ধি ! আবার দেশজুড়ে মতামত সমীক্ষায়, জানুয়ারি ২০১৮তে যে এনডিএ জোটকে কেউই ৩০০ আসনের নীচে রাখেনি সেই জোটকেই ২০১৯ জানুয়ারিতে সমীক্ষার অঙ্ক অনুযায়ী ২৩৩-২৫৭র বেশি আসন দিতে কেউ রাজি নয়। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যে কোনও ম্যাজিকের এপিসেন্টার উত্তরপ্রদেশ। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ২০১৯র জানুয়ারিতে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে সপা-বসপা জোটের একসঙ্গে লড়ার সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে পালটে দিয়েছে উত্তরপ্রদেশ তথা দেশের রাজনৈতিক

অঙ্ক। এই অঙ্ক অনুযায়ী, সপা-বসপা মহাগঠবন্ধন পেতে পারে ৫১টি আসন, বিজেপি-আপনা দল ২৫ এবং কংগ্রেস ৪। তার মানে মহাগঠবন্ধন এবং কংগ্রেস মিলিয়ে ইউপিএর ৫৫ এবং উত্তরপ্রদেশে ২৫টি আসন পেয়ে কেউ কখনও দেশের সরকার গড়তে পারেনি। যদিও দেশের সাধারন নির্বাচনে অঙ্ক নয়, কাজ করে রসায়ন। অখিলেশের কাকা শিবপাল সিং যাদব, ভাইপোর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় এসপি থেকে বেরিয়ে নতুন দল করেছেন প্রগতিশীল সমাজবাদী পার্টি — লোহিয়া (পিএসপিএল)। শিবপালের কথায়, এসপি-বিএসপির মহাগঠবন্ধন আসলে 'ঠগবন্ধন' এবং বিজেপিকে পরাস্ত করতে তিনি হাত বাড়িয়েছেন কংগ্রেসের দিকে। ইতিমধ্যেই তিনি বলতে শুরু করেছেন, "যে (অখিলেশ) তাঁর কাকা ও বাবার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তাঁকে কি মানুষ বিশ্বাস করবে?" যদিও লোহিয়া যুব ব্রিগেডের নেতা অতুল মিশ্র, তাঁর ৪০০ জন অনুগামী নিয়ে যোগ দিয়েছে কংগ্রেসে।

বুয়া-বাবুয়া জোটের পর যে কংগ্রেসকে মনে হচ্ছিল মৃত, বেঁচে ওঠার কোনও আশা নেই, গভীর কোমায় চলে গেছে প্রিয়রঞ্জনের মতই সেই কংগ্রেস আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, প্রিয়ঙ্কা গান্ধি এবং জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার আগমনে, বসন্তবাতাসের মত। এ বাতাস আবেগের বাতাস। রাজনৈতিক রসায়নে এ বাতাস বড় ভয়ঙ্কর। অস্তিত্বসঙ্কটের লড়াইয়ে দাঁড়িয়ে মায়াবতী বিরক্ত হচ্ছেন রাহুলের প্রতি। মানে গুরুত্ব দিচ্ছেন। রাহুলের প্রতি বলছেন "আপনি কথা কম বলুন। কাজ করে দেখান"। বলতে বাধ্য হচ্ছেন কেন না তিনি বিলক্ষণ জানেন, বিএসপির সমর্থকরা খুব ডিসিপ্লিনড। খুব সহজে ট্রান্সফার করা যায় বিএসপির ভোট। যেটা এসপির ক্ষেত্রে খুব একটা সহজ নয় এবং কংগ্রেসের ক্ষেত্রে একেবারেই সম্ভব নয়।

মহিলা ভোট, মুসলিম ভোট এবং ইয়ং জেনেরেশন ভোট কি তাহলে প্রিয়ঙ্কা গান্ধি এবং জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার দিকে হু হু করে চলে যাবে? সম্ভাবনা কম। অন্তত তেমনটাই মনে করছেন, প্রখ্যাত পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজিস্ট প্রশান্ত কিশোর। ২০১৪তে যিনি ছিলেন মোদির পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজিস্ট। ২০১৭তে কাজ করেন কংগ্রেসের হয়ে উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনে। এখন সরাসরি রাজনীতিতে নীতিশ কুমারের সঙ্গে। তাঁর মতে, প্রিয়ঙ্কা উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনে বিশাল প্রভাব ফেলতে পারবেন না। কিন্তু দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের কাছে প্রিয়ঙ্কার একটা গ্রহনযোগ্যতা আছে"।

**পশ্চিমবঙ্গে সবকিছু এবং সবাই 'তৃণমূল' হয়ে গেছে। সিপিএম-বামশরিক ও কংগ্রেস থেকে বহুলোক ঢুকে গেছে তৃণমূলে এবং তৃণমূলের ভিতরে শুরু হয়েছে বিভিন্ন কারণ ও ধরণের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এতে ক্ষতিগ্রস্থ তিনটি দলই কিন্তু বাংলায় মাটি তৈরি করতে লাভবান বিজেপি। পাশাপাশি বিভিন্ন ছোট ছোট বাম ও বাম মনোভাবাপন্ন গোষ্ঠী, সিভিল সোসাইটি আন্দোলনকারী সংস্থা এবং র‍্যাডিক্যাল গোষ্ঠী যারা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম থেকে মমতা মুখ্যমন্ত্রী হওয়া পর্যন্ত সঙ্গে ছিল তাঁরা মমতার থেকে বহুদূরে সরে গেছে।**

যদিও প্রশান্ত-এর এই কথা নেহাত কথার কথা নাও হতে পারে। উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে প্রিয়ঙ্কা যদি বুয়া-বাবুয়া জোটের ভোট কাটতে পারে তাহলে তা কাজে লাগবে বিজেপির। এবং সেক্ষেত্রে এনডিএ শরিক জেডি(ইউ)-র জাতীয় আহ্বায়ক প্রশান্ত কিশোরের তো খুশি হবারই কথা। মোদি-রাহুলের পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজিস্ট প্রশান্ত কিশোর সম্পর্কে কদিন আগে নীতিশ কুমার জানিয়েছেন, "দু দুবার অমিত শাহ আমায় অনুরোধ করেছিলেন আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রশান্তকে দলে নেওয়ার জন্য"।

তাহলে কি বিজেপি ভেবেচিন্তেই ২০১৪-য় মোদি হাওয়ার অন্যতম থিঙ্কট্যাঙ্ক প্রশান্ত কিশোরকে সরিয়ে রেখেছিল জোটসঙ্গীর নিরাপদ আস্তানায়? ২০১৯ নির্বাচনে বিহারের ৪০টি আসন এবং নীতিশ কুমার কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন? এককথায় উত্তর — হ্যাঁ। ২০১৯র মহাভারতে "মিশন ১২৩" বিজেপির সরকার গঠনের একমাত্র চাবিকাঠি। এবং বলাই বাহুল্য "মিশন ১২৩"-তে অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা নেবে বিহার।

## মিশন ১২৩

"মিশন ১২৩" যে বিজেপি হঠাৎ করে আজ ভেবেছে তা নয়। বছরখানেক আগেই বিজেপি বুঝতে পেরেছিল ২০১৯-র নির্বাচন খুব সহজ নির্বাচন নয়। পাঁচ বছর সরকার চালানোর পর স্বাভাবিকভাবেই সরকার বিরোধিতা থাকবেই। সুতরাং সেক্ষেত্রে বিজেপিকে নির্ভর করতে হবে, বিশ্বাসযোগ্য জোটশরিক এবং ভোট পরবর্তী জোট তৈরি করতে সম্ভাবনাময় আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের উপর। ২০১৪ সালে বিজেপির ফোকাস এরিয়া ছিল মূলত উত্তরপ্রদেশ সহ হিন্দি বলয় এবং মহারাষ্ট্র। এই এরিয়ায় ২০১৯-এ বিজেপির আসন সংখ্যা যতটা কমবে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতেই "মিশন ১২৩"।

১২৩ টি লোকসভা কেন্দ্র, যেখানে বিজেপি ২০১৪ সালে জিততে পারেনি অথবা ভোট শতাংশ বাড়লেও দ্বিতীয় স্থানে থেকেছে, সেখান থেকে যত বেশি সম্ভব আসন, অন্তত ৮০-১০০ টি আসন জিততে চায় বিজেপি। এর মধ্যে ওড়িশা, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ-এর ৭৭ টি আসন এবং বাকি ৪৬টি আসন অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা, মিজোরাম, মণিপুর এবং অরুণাচলপ্রদেশ থেকে। তবে "মিশন ১২৩" মুখ থুবড়ে পড়বে যদিনা ২০১৪ সালে বিহারের সাফল্য ধরে না রাখা যায়। ৪০ আসনের বিহার লোকসভায়, পাসোয়ান-সুশীল মোদি-নীতিশের এনডিএ জোটকে ৩২-৩৫ টি আসন পেতেই হবে। বিহারে একা লড়লে বিজেপি ১৫টির বেশি আসন জিততে পারত না কিন্তু একত্রিত হওয়ায় এনডিএ জোট পেতে পারে ৩৫টি আসন। পাশাপাশি বিহারে এনডিএ জোটের নির্বাচনী প্রচারের ঝড়ে প্রভাব পড়তে পারে পাশের রাজ্য উত্তরপ্রদেশের পুর্ব প্রান্তে যেখানে নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুলবেন প্রিয়ঙ্কা গান্ধি। রসায়ন উলটে গেলে বিহারের পশ্চিমে ঝড় তুলতে পারে কংগ্রেস।

তেলেঙ্গানায় ১৭ আসনের লোকসভায় খাতা খোলা মুস্কিল কংগ্রেস-টিডিপি জোট ও বিজেপির। ১৬টি টিআরএস এবং ১টি আসাদুদ্দিন ওয়েসির এআইএমআইএম। যদিও নির্বাচনের পর সরকার গঠন করতে এগিয়ে থাকবে যে দল তাঁদের সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসবে দুজনেই।

কিন্তু কী হবে বাংলায়? কেন সর্বভারতীয় বিজেপি বারবার সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বাংলায়? বিজেপির দাবি ২৩টি আসন পাবে বিজেপি। প্রধান নির্বাচনী ইস্যু কী বিজেপির? —নাগরিকত্ব বিল এবং মমতা সরকারের দুর্নীতি। কিন্তু নাগরিকত্ব বিলের মত বায়বীয় বিষয় নিয়ে বাংলায় যে ২৩টি আসন পাওয়া যাবেনা সেটা বিজেপিও জানে। মেরেকেটে ৭-৯টি আসন পেতে পারে বিজেপি। অধীরের হাত ধরে বাংলায় কংগ্রেস পেতে পারে ১টি আসন। অবশ্যই বিজেপির প্রকাশ্য বা পরোক্ষ সমর্থনে। এছাড়া কংগ্রেস বা সিপিএমের আর কোনও আসন পাওয়ার সম্ভবনা নেই। আর এটাই মমতার জন্য অস্বস্তির এবং বিজেপির জন্য খুশির কারণ। কেন না সিপিএম-কংগ্রেসকে মমতা ৮টি আসনও ছেড়ে দিলে, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়াতে পারত না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সবকিছু এবং সবাই 'তৃণমূল' হয়ে গেছে। সিপিএম-বামশরিক ও কংগ্রেস থেকে বহুলোক ঢুকে গেছে তৃণমূলে এবং তৃণমূলের ভিতরে শুরু হয়েছে বিভিন্ন কারণ ও ধরণের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এতে ক্ষতিগ্রস্থ তিনটি দলই কিন্তু বাংলায় মাটি তৈরি করতে লাভবান বিজেপি। পাশাপাশি বিভিন্ন ছোট ছোট বাম ও বাম মনোভাবাপন্ন গোষ্ঠী, সিভিল সোসাইটি আন্দোলনকারী সংস্থা এবং র‍্যাডিক্যাল গোষ্ঠী যারা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম থেকে মমতা মুখ্যমন্ত্রী হওয়া পর্যন্ত

# এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

**General Rates for Display Ads (INR)**

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

**Special Rates for Local Trade only**
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

**Mechanical Details:** Full Page Bleed {21cm (W) X 28 cm (H)}, Non Bleed {18cm (W) X 25 cm (H)}, Half Page Horizontal {18 cm (W) X 12 cm (H)}, Vertical {8.5 cm (W) X 25 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5.6 cm (W) X 25 cm (H)}, Horizontal 18 cm (W) X 6.5 cm (H), 1/4 Page 8.5 cm (W) X 12 cm (H), 1/6 Page {5.75 cm (W) X 12.2 cm (H)}

*Rates are effective from April 1, 2018 issue*

**বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন**
**কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩**
**উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬**

এখন ডুয়ার্স

সঙ্গে ছিল তাঁরা মমতার থেকে বহুদূরে সরে গেছে। কেন সরে গেল সে অন্য প্রসঙ্গ কিন্তু প্রাথমিক শর্ত হিসেবে আরএসএস-বিজেপিও এটাই চায়। অদ্ভুত হলেও সত্যি, যে সিপিএমকে চুরমার করে ক্ষমতায় এসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁকে এখন সিপিএম-র থেকেও একশো গুণ বেশি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে বিজেপি। বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আগুন জ্বালাতে 'ব্র্যান্ড (মুখ্যমন্ত্রী) মমতা' রাগী-ঝাঁঝালো কথা বলছেন, বাংলার বাইরে থেকে ২৩ দলের নেতৃবৃন্দকে এক মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন, এমনকি বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্না মঞ্চে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী  কিন্তু কিছুতেই সেই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় তৈরি হওয়া মমতার 'নিও লেফট' ঝাঁজ ফিরে আসছে না।

## অ্যাডভান্টেজ মমতা

তবে এত কিছুর পরে এখনও অ্যাডভান্টেজ মমতার দিকে। মমতার মাস অ্যাপিলের ধারেকাছেও বঙ্গ বিজেপির কেউ নেই। ২০১৪-র প্রবল মোদি ঝড়েও তৃণমূল পেয়েছিল ৩৪টি আসন এবং ৪০ শতাংশ ভোট (৩১ শতাংশ-২০০৯)। তুলনায় বিজেপি পেয়েছিল ২টি আসন এবং ১৭ শতাংশ ভোট (৬ শতাংশ-২০০৯)। সংখ্যার হিসাবে লোকসভায় চতুর্থ বৃহত্তম দল তৃণমূল, ২০১৯-এ আবারও ভাল ফল করলে, জোট সরকার তৈরিতে কিংমেকার কিম্বা প্রধানমন্ত্রী পদের অন্যতম জোরালো দাবিদার। এই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে, জ্যোতি বসুর স্টাইলে, বিগত কয়েক বছর ধরে মমতা ক্রমাগত কেন্দ্র সরকারকে আক্রমণ করে গেছেন। উদ্দেশ্য একটাই। বিজেপির সঙ্গে দূরত্বে যাওয়া দল-গোষ্ঠী-ব্যাক্তিদের কাছে টেনে নিজের পাওয়ার সার্কেলকে ক্রমাগত বড় করা, যেটা জ্যোতি বসুও করতেন কেবল প্রধানমন্ত্রীত্বের দৌড়ে ছিলেন না।

আরএসএস-এর প্ল্যান 'বি', নীতিন গডকড়ি এবং রাজনাথ সিং-এর হাত ধরে ফের এনডিএ ক্ষমতায় এলে সম্ভবত মমতা জোটশরিক হিসেবে সমর্থন জানাতেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রিত্বের অন্যতম দাবিদার হওয়ায় তিনি ২০১৯ নির্বাচনে মোদি-শাহকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়বেন না। পাশাপাশি চারিদিক থেকে সর্বশক্তি নিয়ে বারবার ঝাঁপিয়ে পড়বে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, শুধুমাত্র লোকসভায় আসন জেতার জন্য নয়। আগামী কুড়ি বছর ভারতবর্ষে ক্ষমতায় থাকতে হলে এবং বাম-কংগ্রেসকে দেশের মানচিত্র থেকে মুছে দিতে হলে, এনডিএ জোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত নেত্রীকে বিজেপির অবশ্যই দরকার। এটা আরএসএস-বিজেপির রণকৌশল। ক্ষমতায় থাক বা না থাক, সমস্ত অবাম ও অকংগ্রেসি নেতৃত্ব-কে এনডিএ জোটে নিয়ে আসা এবং তাঁদেরকেই বিভিন্ন রাজ্যে এনডিএ জোটের মুখ করে তোলা। বিহারে নীতিশ কুমারের ক্ষেত্রে বিজেপির এই 'টাস্ক' সম্পূর্ণ হয়েছে। এবার পূর্ব ভারতে বিজেপির সবচেয়ে বড় 'টার্গেট' বাংলা এবং বাংলার ব্র্যান্ড মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়'।

মমতার 'টার্গেট' জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী পদ। এবং কৌশল হিসেবেই, ভোট পরবর্তী জোট গঠনে আগ্রহী মমতা। বিজেপির মত মমতাও দেখে নিতে চাইছেন অনেকগুলো রাজনৈতিক ফ্যাক্টর। রাজ্য সহ গোটা দেশের সংখ্যালঘু ভোট, বিজেপির পরবর্তী মুখ মোদি না গডকড়ি, দেশজুড়ে বিজেপি বিরোধী ভোট শতাংশ এবং বিজেপির থেকে দুরত্বে যাওয়া দল ও ব্যাক্তিরা কতখানি প্রভাব ফেলতে পারে বিজেপি বিরোধী হাওয়া তৈরি করতে।

মোদি-মমতার পারস্পরিক এক্সপেরিমেন্টে নিঃসন্দেহে ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে, রাজনৈতিক ভূকম্পের গুরুত্বপূর্ণ এপিসেন্টার হতে চলেছে বাংলা বা পশ্চিমবঙ্গ।

গণতন্ত্রের ৭০: নির্বাচন স্পেশাল

# মোদি বিরোধিতার ঝাঁঝ কতটা ? বাংলায় বসে বোঝা যায় ?

সৌমেন নাগ

'আবার কবে ? বছর পরে'— ভোট নিয়ে এধরণের রঙ্গ তামাশা করাই যায়। বিধানসভা, পৌর, পঞ্চায়েত— জনগণের টাকার শ্রাদ্ধ করে বছর বছর কোনও না কোনও ভোটপরব চলতেই থাকে, যার আরেক নাম গণতন্ত্র। তবে এই ভোট সবচেয়ে বড় ভোট, বাকিদের থেকে আলাদা। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর দেশের প্রতিটি কোণে এই নির্বাচন বোলের শব্দ ওঠে। আমাদের গণতন্ত্র তথা নির্বাচন নিয়ে যে প্রশ্নই উঠুক না কেন এটা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই এই গণতন্ত্র কষ্টিপাথরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি যারা ভারতের স্বাধীনতার প্রায় একই সঙ্গে গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের সাংবিধানিক শাসনতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করেছিল সেখানে কোনও দেশই সেখানকার জনগণের কাছে তাদের সেই প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারেনি। সামরিক শাসনের অট্টহাসি সেখানকার নাগরিকদের সেই সাংবিধানিক অধিকারকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করেছিল, ভারতবর্ষ এর ব্যতিক্রম। এখানে নাগরিকরা তাদের নাগরিক অধিকার নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগ করে চলেছে।

এ বছরেই আবার দেশের সাধারণ নির্বাচন। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে নির্বাচনী ময়দান যুদ্ধে নেমে পড়ার সাজো সাজো রব উঠেছে। দেশের ক্ষমতা আগামী পাঁচ বছরের জন্য কার হাতে থাকবে সেই সম্ভাবনার অঙ্ক কষা শুরু হয়ে গেছে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই আমাদের দেশে সর্বভারতীয় জাতীয় দল বলতে কাগজে কলমে ৭টি রাজনৈতিক দল স্বীকৃতি পেলেও প্রকৃতপক্ষে দুটি রাজনৈতিক দলই সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল হিসাবে গণ্য হতে পারার যোগ্যতা রাখে। এই দুটি দল হল ভারতীয় জনতা পার্টি ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। অপর পাঁচটি দল— বহুজন সমাজ পার্টি, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি, দ্য কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট), দি ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টি এবং সদ্য স্বীকৃত অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস (২০১৬, ২রা সেপ্টেম্বর)। এছাড়া আছে রাজ্যস্তরে স্বীকৃত ২৪টি এবং স্বীকৃতিবিহীন ২০৪৪টি (২০১৮, এপ্রিল ১৬ পর্যন্ত) রাজনৈতিক দল।

জাতীয় দলের স্বীকৃতি পেতে হলে প্রয়োজন চারটি রাজ্যের লোকসভার অথবা রাজ্যের প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৬ শতাংশ ভোট। এ ছাড়া রাজ্য থেকে কমপক্ষে ৪টি লোকসভা আসনে বিজয়ী হওয়া। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত জাতীয় দলগুলি নির্বাচনে সারা দেশে তাদের এক নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে লড়াই করতে পারে। এই ৭টি দল জাতীয় দল হিসাবে স্বীকৃত হলেও ভারতীয় জনতা পার্টি ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ছাড়া আর কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষে যে এককভাবে কেন্দ্রে সরকার গড়ার ক্ষমতা নেই এটাই সত্যি। তাই সাধারণ নির্বাচনে কোন দল আঞ্চলিকতার সীমা অতিক্রম করে জাতীয় সরকার গঠন করার ক্ষমতা রাখে সেই প্রশ্নই বড় করে মাথা চারা দেয়। কারণ দেশের মানুষ দেশের নিরাপত্তাকে এক শক্তিশালী দলের হাতে তুলে দেওয়াকেই অধিকতর নিরাপদ বলে মনে করে। এর আগে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে, তা সে বিজেপির ছত্রছায়াতেই হোক বা কংগ্রেসের সমর্থনেই হোক, যে মিলিজুলি সরকার গঠিত হয়েছিল তা কিন্তু স্থায়ী হয় নি। সেই সরকারের পতন ঘটেছে। দেশকে আবার নির্বাচনের ময়দানে নেমে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে।

*কে হবেন প্রধানমন্ত্রী ?*

এবারের নির্বাচনেও এই স্থায়িত্বের প্রশ্নটি অবধারিত ভাবে ভোটদাতাদের বিবেচনায় আসবে। একথা ভাবার কোনও কারণ নেই এদেশের এক বৃহৎ অংশ ভোটদাতা নিরক্ষর ও দারিদ্রের করাল গ্রাসে কবলিত হলেও তারা সঠিক সময়ে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে তাদের স্বাধীন মতের প্রকাশ ব্যালট বাক্সে জানাবার ক্ষমতা রাখে। একমাত্র ব্রিটেনের ভোটদাতারাই সে দেশের নির্বাচনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই অবিস্মরণীয় নায়ক চার্চিলকে ক্ষমতাচ্যুত করে দুনিয়াকে চমকে দেয় তা নয়, ভারতের ভোটদাতারাও বাংলাদেশের যুদ্ধের ইতিহাসের স্রষ্টা ইন্দিরা গান্ধীকে নির্বাচনে ক্ষমতাচ্যুত করে সারা বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছিল ভারতের গণতন্ত্রের বুনিয়াদ কত শক্তিশালী। এক একই নির্বাচক মন্ডলীই ইন্দিরা গান্ধীকে পরের সাধারণ নির্বাচনে বিপুলভাবে বিজয়ী করে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে জানাতে পেরেছিল তারা ইন্দিরা গান্ধীকে পরাজিত করেছিল এর অর্থ এটা নয় ইন্দিরা বিরোধীদের অবাধ স্বাধীনতা তারা দিয়েছে। প্রয়োজন হলে তারা যেমন ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে তেমনই তারাই আবার তার হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে পারে। এর জন্য প্রতিবেশি রাষ্ট্রের মতন কোনও আয়ুব খান বা জেনারেল মুশারফের প্রয়োজন হয় না।

## বিরোধী বিচিত্রা !

২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ক্ষমতা দখলের ভাবনার রণকৌশলের শলাপরামর্শ। ১৯শে জানুয়ারি কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে তৃণমূল কংগ্রেস সাম্প্রতিক কালের বৃহত্তম জনসমাবেশ সংগঠিত করে তাদের সাংগঠনিক শক্তির প্রমাণ দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলির নেতাদের সমাবেশ মঞ্চে উপস্থিত করে বিজেপি মুক্ত ভারত গড়ার আহ্বান জানালেন। তৃণমূল কংগ্রেসের এই সমাবেশ থেকে যে ব্যাঘ্রগর্জন উচ্চারিত হল তাতে কতখানি রাজনৈতিক বর্ষণ ঘটিয়ে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের মাটিকে কর্ষণযোগ্য করার মতন সিক্ত করতে পারবে সেই প্রশ্ন কিন্তু এখনই উঠতে শুরু করেছে। কংগ্রেসের মল্লিকার্জুন খাড়্গে এই সমাবেশ মঞ্চে উপস্থিত হয়ে দলের পক্ষ থেকে সংহতি প্রকাশ করেছেন অথচ যে প্রদেশের রাজধানীর বুকে এই রাজনৈতিক সমাবেশ হচ্ছে সেই প্রদেশের কংগ্রেস নেতৃত্ব এই সমাবেশকে বয়কট করে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে এই রাজ্যে তৃণমূল সরকার বিজয়ী হোক তা তারা চান না। তৃণমূলও রাজ্য কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীদের ভাঙিয়ে তাদের দলে সামিল করে জানিয়ে চলেছে তারা এই রাজ্য থেকে কংগ্রেসের বিলুপ্তি দেখতে আগ্রহী।

সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপি সরকারের বিকল্প আরেক সর্বভারতীয় দল কংগ্রেস ছাড়া যে সম্ভব নয় তা বুঝতে রাজনৈতিক পণ্ডিত হবার প্রয়োজন হয় না। অথচ দেশের বৃহত্তম নির্বাচনী ক্ষেত্র উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই বহুজন সমাজ পার্টি ও অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী দল নির্বাচনী জোটের কথা ঘোষণা করেছে। দিল্লিতে আম আদমি পার্টি ও কংগ্রেস একে

অপরের পরাজয়ের কামনায় নির্বাচনে লড়াই করার কথা ঘোষণা করেছে অথচ ব্রিগেডে বিজেপি বিরোধী সরকারের জন্য আপ নেতা কেজরিবাল ডাক দিয়েছেন।

সেদিনও ছিলেন বিজেপির নেতা মন্ত্রী, সেই যশোবন্ত সিং সমাবেশে জানিয়েছেন এই লড়াই এক বিশেষ মতাদর্শের লড়াই। মুশকিলটা হচ্ছে এই 'মতাদর্শ' কী? এতদিন তিনি কোন মতাদর্শকে বুকে নিয়ে বিজেপি করে এসেছিলেন? তবে কি মোদি সরকারের মন্ত্রীসভায় তার সেই পুরনো অর্থদপ্তর পাওয়ার স্বপ্ন পুরণ না হওয়ায় সেই এতদিনের মতাদর্শকে ভুল বলে মনে হচ্ছে? বিজেপি বিরোধী সরকার গঠিত হবার পর সেই মন্ত্রীসভায় তার জায়গা না হলে এই সরকারের বিরুদ্ধেও কি তার মতাদর্শের লড়াই শুরু হবে? একই প্রশ্ন তো উঠে আসে আরেক সদ্য প্রাক্তন বিজেপি মন্ত্রীসভার সদস্য অরুণ শৌরিকে ঘিরে। তিনি সমাবেশে জানিয়েছেন, বিজেপিকে হারাতে একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী করতেই হবে।

মাত্র কিছুদিন আগেও অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেগুদেশম পার্টির চন্দ্রবাবু নাইডু বিজেপির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয় সেই রাজ্যে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি যখন বিজেপি সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়ে কেন্দ্রে সরকার গঠনের ডাক এই সমাবেশে উপস্থিত থেকে দেন তখনও তো প্রশ্ন উঠে আসে সেদিন বিজেপির সঙ্গে কোন আদর্শের টানে নির্বাচনী মৈত্রী গড়ে তুলেছিলেন?

এনসিপি-র শরদ পাওয়ার সমাবেশে জানিয়েছেন, 'কাউকে প্রধানমন্ত্রী করতে চাই এমন ভাবনা নিয়ে এখানে আসেননি'। ব্যাপারটা যে 'ঠাকুর ঘরে কে? আমি তো কলা খাইনি'-র মতন এই প্রধানমন্ত্রী কে হবে সেটা যে উপস্থিত রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে প্রবলভাবে উঠে এসেছে তা প্রকাশ পেয়ে গেছে। তাই তো ফারুক আবদুল্লা সমাবেশে তাঁর বক্তৃতায় জানিয়েছেন, 'কেউ যেন না ভাবেন আমি প্রধানমন্ত্রী হব'। এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা এই বিশাল সমাবেশ ও রাজনৈতিক নেতাদের উপস্থিতিতে গর্বিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন 'প্রধানমন্ত্রী কে হবেন ভাবার দরকার নেই। ভোটের পর আমরা ঠিক করব।'

বিএসপি নেত্রী মায়াবতী কিন্তু আগ বাড়িয়ে এর আগেই বলে দিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশ বরাবরই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে নির্ণায়ক ভূমিকা নেয়, এবার তার ব্যতিক্রম হবার কোনও কারণ নেই। মায়াবতীর ইচ্ছে যাতে এই সমাবেশে কোনও প্রভাব ফেলতে না পারে তার জন্য তার জোটসঙ্গী সমাজবাদী নেতা অখিলেশ যাদবকে সমাবেশে বলতে হল 'জনতা যাকে চাইবে, তিনিই হবেন প্রধানমন্ত্রী'।

কংগ্রেস জানে তার দলকে বাদ দিয়ে কেন্দ্রে বিজেপি বিরোধী কোনও সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে তিনটি বিজেপি শাসিত রাজ্যে রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেসের বিজয়ের পর এই বিশ্বাস স্বাভাবিক ভাবেই আরও দৃঢ় হয়েছে। তাদের ঘোষিত নেতা রাহুল গান্ধি। প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদির বিকল্প হিসাবে তারা বহু আগে থাকতেই রাহুল গান্ধির নামকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। তবে তার জন্য প্রয়োজন সবার আগে নরেন্দ্র মোদি সরকারের নির্বাচনে পরাজয়। দেড় শতাব্দী প্রাচীন সেই কংগ্রেস ক্ষয়িষ্ণু হতে হতে তার ইতিহাসে আজ সংসদীয় নির্বাচনের নিরিখে ক্ষুদ্রতম শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধির মত বা রাজীব গান্ধির মত এমন কোনও জনমোহিনী নেতৃত্ব নেই যে কংগ্রেসকে সেই একক শক্তিতে বিজয়ী দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে সেই আস্থা যে আসে নি তা খালি চোখে বোঝা যায়। তবে কংগ্রেস সংসদীয় রাজনীতিতে বৃহত্তম না হলেও অন্ততপক্ষে দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসাবে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা রাখে। তখনই প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবীর প্রশ্নে সে জোরালভাবে রাহুল গান্ধিকে উপস্থিত করার সুযোগ পাবে, তার আগে নয়। তাই কংগ্রেস প্রতিনিধি অভিষেক মনুসিংভি ঘোষণা করতে এগিয়ে আসতে বাধ্য হন, 'প্রধানমন্ত্রী নিয়ে ভোটের পর ভাবা যেতে পারে'।

কলকাতার এই সমাবেশে উপস্থিত সব রাজনৈতিক নেতার মুখে যখন আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রশ্নটি এভাবে উচ্চারিত হল তাতে এটা পরিষ্কার আগামী নির্বাচনে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন সেই প্রশ্নটি যে জোরালোভাবে উঠে আসবে তা তারা শুধু যে স্পষ্টভাবে

**প্রশ্নটা এখানে জেতা বা হারার নয়, প্রশ্নটা বিজেপি-র রাজনৈতিক মতাদর্শের। যারা সেদিন (তৃণমূল, তেলেগু দেশম ইত্যাদি) বিজেপি-র সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছিল এবং সরকার গঠনে সামিল হয়েছিল তারা আজ রাতারাতি বিজেপি-র মধ্যে হিন্দুত্ববাদের সাম্প্রদায়িকতা আবিষ্কার করে দেশকে বাঁচাতে বিজেপি সরকারকে হারাবার যে ডাক দিয়েছে প্রশ্নটা তা নিয়ে। আজকের যে বিজেপি সেদিনও তো সেই বিজেপি ছিল। মুখ বাঁচাতে এক হাস্যস্কর যুক্তি তাঁরা হাজির করতে চাইছেন— অটল বিহারী বাজপেয়ী-লালকৃষ্ণ আদবানিরা ছিলেন ভাল বিজেপি— মোদি-অমিতের এই বিজেপি খারাপ!**

দেখতে পাচ্ছেন তা নয়, তাঁদের মনের গোপন কোনে তাদের অনেকের নাম উঁকি দিয়ে চলেছে। রাজনীতির সিঁড়ির এই উচ্চাকাঙ্খা এক দিকে যেমন জোট বাধার প্রেরণা দেয় তেমনই জোটের পতনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় জোট সরকারের উত্থান ও পতনের ঘটনায় এই উদাহরণ ভুরি ভুরি। মঞ্চে উপস্থিত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়া জোট গঠনের জন্য হাতে মাত্র দুই মাস সময় আছে বলে যখন মনে করিয়ে দেন তখন নিশ্চয়ই তাঁর মন্ত্রীসভা থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘটনার সময়কার বেদনাক্ত মুহূর্তের স্মৃতি বার বার উপস্থিত হয়েছে!

বিজেপি জোটের এই দুর্বলতার কথা জানে এবং তাকেই জনতার চোখে বার বার তুলে ধরতে চাইছে। যে ২৩ জন আঞ্চলিক নেতাকে তৃণমূলের জনসমাবেশের মঞ্চে তৃণমূল নেত্রী উপস্থিত করেছেন তাঁরা কিন্তু অনেকেই পরপর বিপরীত মুখী পদসঞ্চালনে অভ্যস্ত এবং তা এখনও করে চলেছেন। উপস্থিত এই সব নেতারা নিজেরাই তা জানেন বলে বার বার এক লক্ষে অর্থাৎ মোদি হটাও স্লোগানের আওয়াজ তোলার কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। এর আগে ইন্দিরা হটাও আওয়াজ তুলে পরপর বিপরীত মুখী জনতা দল জোট সরকার গঠন করেও মুখ থুবড়ে পড়েছিল। একই ভাবে 'অলি গলি মে শোর হ্যায়, রাজীব গান্ধী চোর হ্যায়'— স্লোগান তুলে ভি পি সিং-এর নেতৃত্বে জোট সরকারের একই পরিণতি ঘটেছিল। চৌধুরী চরণ সিং বা দেবগৌড়ার জোট মন্ত্রিসভার করুণ পরিণতির কথা জনতার স্মৃতি থেকে এত দ্রুত মুছে যেতে পারে না।

## বিরোধিতা কেবলই ভোটকেন্দ্রিক!

সাধারণ নির্বাচন ঘাড়ের কাছে তো একেবারে আকস্মিক ভাবে এসে উপস্থিত হয় নি। নরেন্দ্র মোদির সরকারের মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল পাঁচ বছর আগে। বিজেপি কী, কী তার রাজনীতি বা তার অর্থনীতি তা তো কোনও দলের কাছে অজানা ছিল না। বিজেপির জন্মই তো হিন্দুত্ববাদী ভাবনাকে কেন্দ্র করে। হিন্দু এক প্রাচীন ধর্ম হলেও হিন্দুত্ববাদ তথা হিন্দুত্ববাদী ভাবনা তো সাম্প্রতিক কালের রাজনৈতিক হাতিয়ার। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে থাকতেই এদেশে হিন্দু মহাসভা ও এবং তার উত্তরাধিকারী হিসাবে জনসঙ্ঘ এদেশের মাটিতে যে রাজনৈতিক গণ্ডী কাটতে শুরু করেছিল তা কোনও রাজনৈতিক দলের কাছেই অজানা থাকার কথা নয়। বিজেপির উত্থানের ইতিহাস এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য নয় এবং এই পরিসরে তা সম্ভব নয়। ১৯৯৮ সালের নির্বাচনে যখন বিজেপি তার ২টি লোকসভার (১৯৯৪) আসন সংখ্যাকে বৃদ্ধি করে ৮৫টি আসনে উন্নীত করে তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক (secular) আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে মোর্চা গঠন করার সময় যেমন হিন্দুত্ববাদী ছিল তেমনই ১৯৯১ সালে যখন তার শক্তি বৃদ্ধি করে ১১৯ এবং ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালে যখন উভয় ক্ষেত্রে ১৮২টি আসন জয় করে এনডিএ-র বৃহত্তম দল হিসাবে ৫৪৩টি আসন বিশিষ্ট লোকসভায় জোট সরকার গঠন করেছিল তখনও তার রাজনৈতিক দর্শনে হিন্দুত্ববাদের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। ২০০৪ সালের নির্বাচনে অবশ্য বিজেপির লোকসভার আসনের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১৩৮টি আর কংগ্রেস ১৪৫টি আসন জিতে বামফ্রন্টের ৬০ জন সদস্য সহ অন্য আঞ্চলিক দলগুলির সমর্থনে (২১৮) সরকার গঠন করেছিল।

প্রশ্নটা এখানে জেতা বা হারার নয়, প্রশ্নটা বিজেপি-র রাজনৈতিক মতাদর্শের। যারা সেদিন (তৃণমূল, তেলেগু দেশম ইত্যাদি) বিজেপি-র সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছিল এবং সরকার গঠনে সামিল হয়েছিল তারা আজ রাতারাতি বিজেপি-র মধ্যে হিন্দুত্ববাদের সাম্প্রদায়িকতা আবিষ্কার করে দেশকে বাঁচাতে বিজেপি সরকারকে হারাবার যে ডাক দিয়েছে প্রশ্নটা তা নিয়ে। আজকের যে বিজেপি সেদিনও তো সেই বিজেপি ছিল। মুখ বাঁচাতে এক হাস্যস্কর যুক্তি তাঁরা হাজির করতে চাইছেন— অটল বিহারী বাজপেয়ী-লালকৃষ্ণ আদবানিরা ছিলেন ভাল বিজেপি— মোদি-অমিতের এই বিজেপি খারাপ!

আমাদের ভোট রাজনীতির এটাই বড় সমস্যা। এখানে আদর্শগত লড়াইয়ের পরিবর্তে ব্যক্তিগত আক্রমণই তীব্র। এক সময় কংগ্রেস ছিল মূল শত্রু। সেখানেও কংগ্রেস নয় কংগ্রেস বিরোধিতার নামে সেই লড়াইকে নামিয়ে আনা হয়েছিল ব্যক্তিগত আক্রমণে। অবিভক্ত সিপিআই সে সময় কংগ্রেস রাজনীতির প্রশ্নে তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকাকে সামনে আনতে চেয়েছিল বলে তারা 'দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট' বলে শুধু চিহ্নিত হয়েছিলেন তা নয়, প্রমোদ দাশগুপ্ত, সুন্দরাইয়া,

জ্যোতিবাবুরা সেই দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট নেতৃত্বের স্পর্শ এড়াতে পৃথক দল সিপিএম গঠন করেছিলেন। তাঁদের কংগ্রেস বিরোধিতা এত তীব্র ছিল যে এই কলকাতার ময়দানে জ্যোতিবাবু-অটলবিহারী বাজপেয়ী হাতে হাত মিলিয়ে উর্দ্ধাকাশে তুলে ধরে দেশকে কংগ্রেসমুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ভারত ও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন মৈত্রী চুক্তি ও স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে অবিস্মরণীয় ভূমিকায় দীপ্ত ইন্দিরা গান্ধিকে দেয়ালে দেয়ালে ডাইনি বলে চিত্রিত করে তাকে পরাজিত করার আহ্বান জানান হয়েছিল সেই বামদলগুলিই পরবর্তীকালে সোনিয়া গান্ধীর কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধেছে বারবার। সেদিন যে কংগ্রেস ছিল আজও তো সেই কংগ্রেসই আছে! নাকি সেই কংগ্রেস ছিল খারাপ কংগ্রেস, আর এখনকার কংগ্রেস ভাল কংগ্রেস?

দেশের আঞ্চলিক দলগুলির এটাই মজা! সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও বিজেপি একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে আসতে বাধ্য। এর কারণ উভয় দল কেবলমাত্র নিজেদের সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল বলে দাবি করতে পারে এবং কেন্দ্রে সরকার গঠনের আশা রাখে। এখানে উভয়দলের আদর্শগত ভাবনা নিয়ে যতখানি তীব্র লড়াই তার থেকেও কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হবার সম্ভাবনার প্রশ্নে তাদের এই লড়াই আরও তীব্র হতে বাধ্য। কংগ্রেস যে প্রাদেশিক দলগুলির সঙ্গে জোট গঠনে আগ্রহী তারা যে আদর্শগতভাবে বিজেপি বিরোধী তা নয়। এর কারণ, সবাই জানে দূর্বল কংগ্রেসকে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসতে হলে এই আঞ্চলিক দলগুলির সমর্থনের প্রয়োজন। আঞ্চলিক দলগুলি আদর্শগতভাবে বিজেপি বিরোধী একথা ভাবার কারণ নেই। তারা অঙ্ক কষে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে কোনও সর্বভারতীয় দলের সঙ্গে থেকে তারা ক্ষমতার স্বাদ বেশি করে পেতে পারবে। বিজেপি কেন্দ্রে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে একক দলীয় ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে ফেলেছিল। ক্ষমতার ভাগকে আর কারো মধ্যে ছিটে ফোঁটাও ভাগ করতে দেয়নি। আবার সেই গরিষ্ঠতা পেলে অবস্থা আবার করুণ হবে। এখন সবাই তাই বিজেপি বিরোধী। তাই বলে সবাই এখুনি কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী জোট করতে এগিয়ে আসছে না। এর কারণও কোনও আদর্শগত ভাবনা নয়। কাল কংগ্রেস যদি এককভাবে ক্ষমতায় যায় তখন দেখা যাবে এই দলগুলিই আবার অতীতের মতন 'কংগ্রেস মুক্ত ভারত' গড়তে বিজেপির সহযোগী হতে কোনও দ্বিধা করবে না।

## বাংলায় ফিরে এসো বাবা!

পশ্চিমবাংলার চিত্র বাকি রাজ্যগুলি থেকে একেবারে ভিন্ন। রাজনীতির আঙ্গিনায় এখন তৃণমূল তাদের সর্বগ্রাসী শক্তিকে প্রসারিত করেছে। প্রশাসনের সুযোগ সন্ধানীরা জানেন এখানে যোগ্যতার বদলে আনুগত্যকেই সব বিবেচনার শীর্ষে রাখা হয়। তাই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে কে কতখানি অনুগত তার প্রমাণে। এই আনুগত্যের ঢেউ সুনামীর বিধ্বংসী তাণ্ডবের মতন জনজীবনকে তছনছ করে দিতে চাইছে। বাংলার যে বুদ্ধিজীবি সমাজ এক সময় তাদের স্বাধীন সত্তা ও গঠনমূলক চেতনায় সর্বভারতীয় আঙ্গিনায় নেতৃত্ব দিত তারাই আজ ক্ষমতাবানের কৃপার আশায় 'অনুপ্রেরণার' জোয়ারে সাঁতার কাটতে হাবুডুবু খেয়ে চলেছে। এখানে আর কোনও সৃষ্টি নিজস্ব প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে না, সবই ঘটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক সফল জননেত্রী— এতে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর আদর্শ সংগ্রামী চেনতা ও সংবেদনশীল মন তাঁকে এক সামান্য পরিবার থেকে উঠে এসে একের পর এক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জয়ী করে আজকের এই অভুতপূর্ব জননেত্রীর আসনে বসিয়েছে। বামফ্রন্টের নেতৃত্ব স্তাবকতার পর্দার ওপারের মানসিকতাকে বোঝার চেষ্টা করেননি। তার মূল্য চোকাতে হয়েছে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে।

কিন্তু ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হচ্ছে ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা নিই না। তাই এক সম্রাট তার পূর্ববর্তী সম্রাটের পতন ও তার কারণ জেনেও তার থেকে শিক্ষা না নিয়ে নিজের রাজত্বকে চিরস্থায়ী অক্ষয় বলে মনে করে একই পরিণতিকে ডেকে আনে। স্তাবকতার চোরাবালির মধ্যে চোখ দিয়ে না দেখে কান দিয়ে দেখার প্রবণতা দেখা যায়। ২৩৫ বনাম ৩৫ বিধায়ক যেমন বামফ্রন্টের প্রকৃত শক্তির পরিচয় ছিল না তেমনই আজকের তৃণমূলের বিধায়ক ও তার বিধায়কের শক্তির পার্থক্য কিন্তু তৃণমূল ও তৃণমূল বিরোধী শক্তির পার্থক্যকে উপস্থিত করে না। গত আট বছর ধরে দলমত নির্বিশেষে যে কেউ অবাধে তৃণমূলে যোগ দিয়ে চলেছে, তার বিষময় ফলই হল গোটা রাজ্য জুড়ে গোষ্ঠীসংঘর্ষ, হিংসা, খুন। যা এককথায় আজ নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণক্ষমতার বাইরে।

আজ তাই রাজ্য জুড়ে নেতিবাচক বিরোধী ভোটের শংকা। হিন্দুত্ববাদের সংক্রমণ অস্বীকার করবার উপায় নেই, কিন্তু তাই বলে পশ্চিমবাংলার মানুষ বিজেপির হিন্দুত্ববাদের আদর্শের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে এমন বিশ্বাস করাও কঠিন। বিজেপি-র সংগঠনও এরাজ্যে হীনবল। তবু দিকে দিকে বিজেপি-জুজুর ছায়া। অন্তত তৃণমূল নেতাদের কামান-দাগা থেকেই তা স্পষ্ট। তৃণমূলী আগ্রাসন ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে কংগ্রেস ও বামদলগুলির ভোটব্যাংকের ক্রমাগত অবলুপ্তি সেই ছায়াকে আরও প্রকট করে তুলেছে।

তবু মমতা লড়ে চলেছেন। বিকল্প জোটের নেতা হিসেবে তিনিই যোগ্যতম, এ দাবিকে নস্যাৎ করবার ক্ষমতা ভোট-রাজনীতির হিসেব জানা কোনও মানুষের নেই, মোদী-অমিত শাহেরও নেই। কিন্তু তার জন্য সবার আগে আসন সংখ্যায় তাঁকে গতবারের মতই এগিয়ে থাকতে হবে। অথচ সে পথে অন্তরায় তিনটি। এক, সংখ্যাগরিষ্ঠতা সুনিশ্চিত করতে বিজেপি-র এবার বাংলা থেকে যত বেশি সম্ভব আসন চাই, এবং তার জন্য মোদীরা দৃশ্যতই সবরকমভাবে মরীয়া এবং দলের সব শিবির এককাট্টা। একদিকে যেমন 'খুলে-আম' সিবিআই অস্ত্র শানিয়ে ভয় দেখানো চলছে, অন্যদিকে তেমনই বাইরের রাজ্যে জনসভায় গিয়ে অপ্রাসঙ্গিকভাবে মমতা ব্যানার্জিকে গুরুত্ব দিয়ে অন্যান্য প্রধানমন্ত্রী-কাঙ্খীদের মধ্যে ঈর্ষা জাগিয়ে দূরত্ব তৈরির কাজ সুচতুরভাবে করে চলেছেন মোদী-শাহ যুগলবন্দী। দুই, আরও অনেকের মতই গান্ধি-প্রধানমন্ত্রীত্ব মেনে নিতে নারাজ মমতাও, তা তিনি প্রথম দিন থেকেই বুঝিয়ে দিয়েছেন, এবং সেটাই স্বাভাবিক। তিন, গত আট বছর ধরে তৈরি হওয়া তাঁর নিজের দল তাঁকে শেষ পর্যন্ত কী উপহার দেবে সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

নতুন প্রজন্মের ভোটদাতারা ইতিহাস উল্টেপাল্টে দেখে তারপর ভোট দিতে যায় না ঠিকই, কিন্তু বিরোধী জোটের মধ্যে সংহতির অভাব তাদের চোখ এড়িয়ে যাবে এমনটি ভাববার কারণ নেই। মোদি বিরোধিতায় গলা মিলিয়েছে সব দল, খবরের কাগজের পাতায় তা এখনও সুস্পষ্ট (কবে পাল্টে যাবে তা কেউ জানে না!)। কিন্তু আঞ্চলিক দলগুলির সেই বিরোধিতা আদপে কতটা মোদিকে হটানো আর কেন্দ্রের আগামী সরকারে কতটা নিজেদের ভাঁও বাড়ানোর দর কষাকষি— সেই ছবি প্রকট হয়ে উঠবে ভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণার পরেই। দিল্লির মসনদে বাংলা কতটা গুরুত্ব পেতে চলেছে সেও ক্রমশ প্রকাশ্য!

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch
(Air Conditioned)

| Room | Single | Double |
|---|---|---|
| Super Deluxe (Non AC | Rs. 650 | 900 |
| Deluxe AC | Rs. 990 | 1200 |
| Super Deluxe AC | Rs. 1100 | 1300 |
| VIP Deluxe AC | Rs. 2000 | 2000 |
| Suite | Rs. 3000 | 3000 |
| VIP Suite | Rs. 3500 | 3500 |
| Extra Occupancy (N-AC) | Rs. 100 | -- |
| Extra Occupancy (SC) | Rs. 200 | -- |

**N.B.** *Tax as per applicable*

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar
Tel. No. +91 9735526252, (03582) 227885/231710
Email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubrajcoochbehar.com

# শপিং বিবর্তন মহাবণিকের সুদিন বাকিদের লাভের ঘরে সেই শূন্য

প্রশান্তনাথ চৌধুরী

**বিগত শতাব্দীর শেষ প্রান্তে উন্নত দেশগুলোতে শপিং কমপ্লেক্স ডানা মেলতে শুরু করেছিল, যা এই শতাব্দীতে বিপুল উচ্চতায় পৌছেছে। একই বা সংলগ্ন ঝাঁ চকচকে ছাদের তলায় আলু পেঁয়াজ থেকে স্কচ, জুতো থেকে ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জামের বিপুল ভান্ডার। ট্রলি ঠেলে এসি বাজারে ঘুরে ঘুরে বাজার করুন, কফি মগ হাতে রেস্তোরায় বিশ্রাম করুন। ফ্লোরে মহার্ঘ সিনেমা হল। বিনোদনের হরেক উপকরণ। আমাদের দেশে বিগত দশ বছরে আম্বানি থেকে টাটা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই ব্যবসায়। ছোট ব্যবসায়ীদের চিড়ে চ্যাপ্টা অবস্থা, চলছে টিকে থাকার লড়াই।**

আমাদের শৈশবে মহিলারা বাজারে খুব একটা যেতেন না। এখনও মফঃস্বল শহরের নারীকুল মুদির দোকানে বা দৈনিক মাছ-সব্জির বাজারে ততটা স্বচ্ছন্দ নন। পরিবারের কাঠামো বা চাকরির ধারাতে পরিবর্তনের কারণে বাধ্য হয়ে কিছু মহিলাকে নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই কেনাকাটা করতে হয়। কিছুদিন আগেও মুটের মাথায় শাড়ি কাপড় চাপিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ফেরিওয়ালা ঘুরে বেড়াত। কম্বল, মশারি থেকে বাসনপত্র বা মোজা টুপি থেকে দই মিষ্টি পাওয়া যেত তবে মাছ বা সব্জি দৈনিক বিক্রির তেমন প্রচলন ছিল না। শীতকালে ভোর বেলায় খেজুরের মিষ্টি রসের হাঁড়ি নিয় বিহারী রসিয়া-দের আর দেখা যায় না। আর চৈত্রের শুনশান দুপুরে শুকনো হাওয়ায় ভেসে আসত শাঁখা বিক্রেতার মন কেমন করা ডাক, এখন তাদেরও স্বর আর ভেসে আসে না। শৈশবে চা বাগানে দেখেছি শাড়ি কাপড়, বাসনপত্র, সোনার গহনা থেকে মিষ্টি এসব কিছুই বিক্রি করতে শহর থেকে ব্যাবসায়ীরা আসতেন। আমরা তাদের দাদা বা কাকু বলে ডাকতাম আর তারা আমাদের মাকে বৌদি বা মাসিমা বলতেন। কাকু শাড়ি দেখাতে দেখাতে বলছেন-"আজ স্পেশাল কি রান্না হল"? মা বললেন "মাগুর মাছ"। কাকু বললেন "ঘুরে আসছি"। আরও কিছু বাবুদের বাসায় বিকিকিনি করে ভরদুপুরে এসে স্নান করে রান্নাঘরের বারান্দায় পিড়িঁতে বসে মধ্যাহ্ন আহার সারলেন। পরে বাইরে ঘরে একটু বিশ্রাম নিয়ে রোদ পড়ে এলে বেড়িয়ে পড়তেন অন্য কোনও জনপদের উদ্দেশে। এইসব ছোট শহরের বড় ও ছোট দোকানদারদের সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্কও ছিল একান্তই পারিবারিক। সেই পরম্পরার পরিসমাপ্তি ঘটেছে এমনটা বলছি না তবে এত নতুন নতুন মানুষরা শহরে বাসা বেঁধেছেন যাদের ওই দোকানদার শ্রেণীর সঙ্গে শুধুই ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক।

গত শতাব্দির ষাটের দশক নাগাদ বাংলায় শহুরে মহিলাদের মধ্যে অধিকাংশই শাড়ি কাপড়, বাসনপত্র, প্রসাধনী ইত্যাদি কেনাকাটায় অভ্যস্ত হয়ে উঠল। শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনুপাতিক হারে ছোট ব্যাবসাদারের সংখ্যাও বেড়ে গেল। এক সমীক্ষায় দেখা গেল ১৯৯১ থেকে ২০১৬ সন এই ২৫ বছরে পরিষেবার ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বেড়েছে ৩৫০ শতাংশ, ক্ষুদ্র ব্যবসায় ২১২ শতাংশ এবং ক্ষুদ্র শিল্পে মাত্র ১১৭ শতাংশ, অন্যদিকে কৃষিতে কর্মসংস্থান প্রায় স্থির। এক বেসরকারি সমীক্ষায় জানা যায় কয়েকটি ট্রেডে এই মুহূর্তে একটু স্কিল বাড়ালেই ৫০লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব, যেমন প্লাম্বার (জলের কল ও পাইপের কাজ), মোবাইল সারাই, গৃহ সেবিকা (হোম নার্সিং), গৃহের বিদ্যুত লাইনের কাজ, ফ্রিজ ও এসি মেসিন সারাই, গৃহস্থালি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সারাই, মোটর গাড়ি ও দুচাকার গাড়ি ধোয়া-মোছা, রং মিস্ত্রির কাজ। অন্য পরিসরে সে আলোচনা করা যাবে।

বিগত শতাব্দীর শেষ প্রান্তে উন্নত দেশগুলোতে শপিং কমপ্লেক্স ডানা মেলতে শুরু করেছিল, যা এই শতাব্দীতে বিপুল উচ্চতায় পৌছেছে। একই বা সংলগ্ন ঝাঁ চকচকে ছাদের তলায় আলু পেঁয়াজ থেকে স্কচ, জুতো থেকে ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জামের বিপুল ভান্ডার। ট্রলি ঠেলে এসি বাজারে ঘুরে ঘুরে বাজার করুন, কফি মগ হাতে রেস্তোরায় বিশ্রাম করুন। ফ্লোরে মহার্ঘ সিনেমা হল। বিনোদনের হরেক উপকরণ। বাইরে খদ্দের প্রলোভিত করতে বড় বড় বিজ্ঞাপন, ডিসকাউন্টের। বিক্রিত টাকার পরিমানের উপর পয়েন্ট অর্থাৎ আগামীতে এলে আরও বেশী ছাড়ের অফার, আরও ক্রয় আরও পয়েন্ট লাভ। আমাদের দেশে বিগত দশ বছরে আম্বানি থেকে টাটা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই ব্যবসায়। ছোট ব্যবসায়ীদের চিড়ে চ্যাপ্টা অবস্থা, চলছে টিকে থাকার লড়াই।

এই মুহূর্তে শিলিগুড়িতে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় দু ডজন শপিং কমপ্লেক্স। ধূপগুড়ির মত আধা শহর এবং কৃষি ভিত্তিক এলাকায় দুটো মল রমরমিয়ে চলছে। আসলে শপিং সেন্টার, শপিং কমপ্লেক্স, শপিং মল নামে ভিন্ন কিন্তু কাজে এক। শপিং সেন্টারে বেশ কিছু খুচরো দোকান এবং পরিসেবার সাথে যথেষ্ট পার্কিং-এর ব্যবস্থা থাকে, একে শপিং প্লাজাও বলা হয়। ২০১৪ সনের একটা হিসেবে দেখা যায় ইউরোপে ২২২টি শপিং মল আছে যার মিলিত বিক্রয়ের পরিমাণ ১২.৪৭ বিলিয়ন পাউন্ড। সবাইকে টেক্কা দিয়েছে দুবাই মল যা নাকি ৫০ টা ফুটবল মাঠের মত এলাকা জুড়ে। ভারতবর্ষের কোচিতে অবস্থিত লুলু ইন্টারন্যাশনাল

শপিং মল, নিউ দিল্লির সিলেক্ট সিটি ওয়াক, মুম্বাই-এর ফোনিক্স সার্কেল এবং কলকাতায় সিটি সেন্টার আকারে এবং ব্যবসায় প্রথম সারিতে।

বড় শপিং মলগুলোতে পার্কিং এর ব্যবস্থা কম বেশি আছে, তবে মফস্বল শহরের মলগুলোয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পার্কিং-এর কোনও ব্যবস্থা নেই। কয়েকদিন আগে ঢুকে পড়েছিলাম জলপাইগুড়ির এক শপিং মলে। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা কেনাবেচার বাইরে অন্য কথা বলতে চায় না। তবে এক তরুণ স্মার্ট ম্যানেজারের সাথে কথা বলে খুশিই হয়েছিলাম। বলেছিলেন এখন মাসিক গড় বিক্রি ৯০ লক্ষ টাকা। তিনতলা জুড়ে প্রায় ১২০০০ স্কোয়ার ফুটের মল। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। কসকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা। নিজস্ব কর্মি ৪০ জন। তাছড়া হাউস কিপিং ও সিকিউরিটির ১০ জন কর্মি এজেন্সি থেকে নেওয়া হয়েছে।

নিজস্ব কর্মিদের নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক, কতটা চালাক চতুর দেখে নেওয়া হয়। নিয়োগের পর দশদিনের একটা আভ্যন্তরীণ (ইন হাউস) প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর ওরা সরাসরি ক্রেতা সামলানোর কাজে লেগে পরে। বেতন ৮০০০ টাকা, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ইএসআই এর সুবিধে আছে। খদ্দের এল, এসি উপভোগ করে কিছুটা সময় কাটিয়ে চলে গেল, চলবে না। পেছনে লেগে থেকে খদ্দেরের পকেট থেকে টাকা খসিয়ে জিনিস পত্র গছাতে হবে। আর সে কাজটা যে যত কুশলতার সাথে করবে সে তত সফল। সাধারণত মেয়েদের রাতের শিফটে রাখা হয় না। একটি মেয়ে ছ'মাস কাজ করলেই অদ্ভুত দক্ষতায় খদ্দেরের রুচি, ওয়ালেটের ওজন এসব বুঝতে পারে। বল থেকে ব্লেজার-এর স্টক ঠিক রাখা, প্যাকেজিং আকর্ষনীয় রাখা এই ব্যবসার একটা বড় চ্যালঞ্জ।

একটা ছোট মলে যেমন বছরে ১০-১২ কোটি টাকার ব্যবসা হয়, বছরে ২০০০ কোটি টাকা ব্যবসা হয় এমন শপিং মলের সংখ্যাও কম নয়। মলের সঙ্গে যেসব রেস্তোঁরা আছে সেগুলোও ব্যবসা বৃদ্ধি করে চলেছে। সঙ্গে দোসর মাল্টিপ্লেক্স-এর সিনেমা, যার গড় টিকিটের মূল্য ২০০ টাকা, এক প্যাকেট পপকর্নের দামও কাছাকাছি। ফেরার পথে ভাবছিলাম, ভোগ বা বাজার অর্থনীতির এ দুনিয়ায় কিছু কর্মসংস্থান যে হচ্ছে না তা নয়, অন্যদিকে কর্মহীন হয়ে পড়ছে ছোট দোকানি বা কর্মচারিরা। শপিং মলে বণিকরাও যে এখনই ভীষণ লাভবান তাও নয়, কিন্তু বিশাল অট্টালিকা কালে কালে তৈরি করবে নিজেদের ব্র্যান্ড ভ্যালু, যার মুনাফা আগামী বছরগুলিতে মিলবে অনলাইন বিক্রিতেও। ফলে পুরনো ফেরিওয়ালাদের মতই হাপিশ হয়ে যাবে পাড়ার মুদি দোকানি, বহু ছোট বা মাঝারি ব্র্যান্ড শপ। এই যোগবিয়োগের খেলায় আদৌ কি অগ্রগতি সম্ভব আমাদের? ই-দুনিয়ায় পৌঁছেও আমাদের লাভের ঘরে কি পড়েই থাকছে না সেই শূন্য?


## এখন ডুয়ার্স-এ লেখা পাঠান

## হাতে লিখে নয়, টাইপ করে

ডুয়ার্স সংক্রান্ত আপনার কোনও লেখা থাকলে টাইপ করে পাঠান। আপনার লেখা সম্পাদকমন্ডলীর পছন্দ হলে এই পত্রিকায় তা ছাপা হবে। লেখার বিষয়বস্তুর উপর ছবি থাকলে অবশ্যই পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা এখন ডুয়ার্স। শান্তি পাড়া। অনিমা লজের পেছনে। জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১। অথবা মেল করতে পারেন নিচের মেল আইডি-তে

editor.ekhonduars@ yahoo.com

এখন ডুয়ার্স

**ডুয়ার্সের নিজস্ব বই ও পত্রিকা**

পরিবেশ | পরিকাঠামো | পর্যটন
জঙ্গল | জনসত্ত্বা
শিক্ষা | স্বাস্থ্য | সাহিত্য | সংস্কৃতি

# ডুয়ার্স থেকে দার্জিলিং

তৃতীয় পর্ব

*টাইগার হিল থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা*

সূর্য উঠবেন আন্দাজ সাড়ে পাঁচটায়। হোটেল থেকে টাইগার হিল এক ঘন্টার কমে পৌঁছে যাব। কিন্তু আগে আগে পৌঁছলে ভিউ পয়েন্টের কাছাকাছি গাড়ি রাখা যাবে। নয় তো হাঁটতে হতে পারে বেশ খানিকটা। সঙ্গে বাচ্চা না থাকলে না হয় হাঁটা যেত। অতএব, সাড়ে তিনটের একটু আগে হোটেলের বাইরে এসে দেখি আকাশ ঝলমল করছে তারায়। টাইগার হিল গমনের পক্ষে এর চাইতে ভাল খবর আর কিছু হয় না। রাস্তা অবশ্য জনমানবশূন্য। কুয়াশার লেশমাত্র নেই। হঠাৎ একটা-দুটো গাড়ি। বোধহয় বাঘাহিলে যাচ্ছে।

অকস্মাৎ একজনকে আসতে দেখা গেল। সে আমার সামনে এসে একটু ইতস্তত করে বলল, ‘গাড়ি তো আপ বুক কিয়া?’

জানালাম, বুক কিয়া। তারপর জিগ্যেস করলাম, ‘আপনার হয় নি?’

‘ক্যান্সেল কর দিয়া!’ খুব দুঃখের সঙ্গে সে বলে। জানা গেল, একটু আগে যখন পার্টিকে আনতে যাবে বলে ফোন করেছে তখন পার্টি বলেছে, যেতে পারবে না। অ্যাডভান্স নেয় নি।

বেচারার দুঃখটা বুঝলাম। একটু পরে যখন বসনের গাড়ি চেপে দার্জিলিং শহরের এ গলি সে গলি বেয়ে চলছি, তখন প্রসঙ্গটা তুললাম। বসন্ মুচকি হেসে বলল, ওই ড্রাইভারের পার্টি আগের দিন সকাল সাতটায় বেরিয়ে রাত ন-টায় ফিরেছে। তখনই বোঝা উচিত

ছিল যে আজ ভোরে কাহিল হয়ে পড়বে। তা ছাড়া, পার্টি আজ রাতেই এনজেপি থেকে ট্রেন ধরে ফিরবে কলকাতায়।

সামনেই ঝকঝকে একটা ভোরবেলা আসতে চলেছে। কুয়াশাহীন টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখা মিস করল বলে অজানা পর্যটকদের জন্য একটু দুঃখ হল। কিন্তু বেড়াতে এসে দৌড়োতে নেই। দৈনন্দিন দৌড়োদৌড়ি থেকে মুক্তি পেয়ে দু-দন্ড স্থির হব বলেই

তো বেড়াতে আসা!

টাইগার হিলে পাহাড়ি মহিলারা ফ্লাস্কে চা-কফি নিয়ে ঘুরে বেড়ান। সাড়ে চারটের কাছাকাছি ভিউ পয়েন্টের নিচে গাড়ি থামাল বসন্। গাড়ির ভিড় সবে জমতে শুরু করেছে। গাড়ি থেকে নেমে ওপরে উঠতে উঠতে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম। এই কয়েক মিনিটেই কম করে আরও তিরিশটা গাড়ি চলে এসেছে। পৌনে পাঁচটার মধ্যে টাইগার হিলে অষ্টমীর ভিড়। সরকার এখানে টুরিস্টদের জন্য গ্যালারি তৈরি করতে শুরু করেছে। পাশেই উঠছে একটা টাওয়ার। গ্যালারির কাঠামো তৈরি হলেও কাজ বাকি। তবে সেখানে বসা যাচ্ছে। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে গ্যালারির তলায় একটা ছোট্ট দোকান পাওয়া গেল। চা আর সিগারেট।

পৃথিবী ঘুরছে। ক্রমে ক্রমে আলো আসিতে লাগিল। এবার একটা বিষয় নজরে পড়ল। পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে সূর্য উঠি উঠি। উল্টো দিকের কাঞ্চনজঙ্ঘার টোপরে শুরু হয়েছে রঙের সেই অলৌকিক বদল। লক্ষ্য করলাম, পাশের একটি কিশোর পুবদিকে মুখ করে মোবাইল তাক করে আছে। বলতে যাচ্ছিলাম, ভাই ওদিকটা দ্যাখ।

কিন্তু বলতে গিয়ে থমকে গেলাম। ভিড়ের বড়ো অংশই মোবাইল বাগিয়ে তাকিয়ে আছে সূর্য দেখবে বলে। সূর্য উঠতেই শোনা গেল প্রবল গর্জন --- 'উঠেছে! উঠেছে!'

সূর্য উঠল। কাঞ্চজঙ্ঘার টোপর রঙ মিলেমিশে যাওয়ায় আবার শাদা। এবার ভিড় ঘুরল সেদিকে। আবার গর্জন— 'ওই যে! ওই যে!' মনে মনে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। টাইগার হিলের খ্যাতি নিছক সূর্যোদয়ের কারণে নয়। সূর্য তো পাহাড়ের সব কোনাতেই ওঠে। কিন্তু দিনমণির প্রথম নবীন আলো তুষারোন্নত শিরে কোন মায়া সৃষ্টি করে, তা প্রত্যক্ষ করার অন্যতম কেন্দ্র এই পাহাড়— বিশেষ করে টুরিস্টদের কাছে। তা হলে কি অনুপ্রেরণার ছটায় এখন টাইগার হিল ফেমাস ফর বোথ সান এন্ড কাঞ্চনজঙ্ঘা রাইজিং?

যাক গে! সূর্য পুরো উঠে গেছে। ফুটফুটে শীতল সকাল। সুযোগ পেলে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখার পর জায়গাটা খালি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। হঠাৎ দেখবেন সব শান্ত হয়ে গেছে। স্কুল ইউনিফর্ম পরা বাচ্চারা পথে নামছে একটি দুটি করে। এবার ফিরতে শুরু করুন। টাইগার হিলে সূর্যোদয়ের পর স্থানীয় জনপদে সকাল হয়েছে। এবার চা-বিস্কুট খেতে হবে কোনও একটা ছোট্ট দোকানে বসে যার উল্টো দিকে হাওয়ায় নড়ছে ঢালু অরণ্য।

এটা গাইড বুকে নেই।

ওদিকে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় সাদা বাঘেরা বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। দুপুর বারোটা নাগাদ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটু বিষণ্ণ বোধ করলাম। আহা! ক-টাই বা টিকে আছে এরা! বিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ান সম্ভব, কিন্তু বন্দুকের বিবর্তনের সঙ্গে কী ভাবে? তবে রয়াল বেঙ্গলটি বেশ মেজাজে ছিলেন। দৌড়োদৌড়ি করে ভরপুর বিনোদন যোগাচ্ছিলেন মামা! কালো ভাল্লুককে একটু ভাবিত মনে হল। ম্যাকাওরা চপল। সবাই কমবেশি উত্তেজিত, কেবল পান্ডাবাবুকে দেখলাম গাছের ডালে লেজ ঝুলিয়ে ঘুমোচ্ছে।

যাদুঘরগুলো বেশ ভালো। সন্দেহ নেই পর্বতারোহন একটি দুঃসাহসি কর্ম। মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের যাদুঘরে ঢুকলে সেটা আরেকবার টের পাওয়া যায়। অপর যাদুঘরে স্টাফ করে রাখা প্রাণীদের মধ্যে একটা ধনেশ পাখি আছে। তার ঠোঁটের সাইজ দেখে মন মনে

*টাইগার হিলে চলছে গ্যালারি তৈরির কাজ*

পরলোকগত পাখির আত্মাকে অভিনন্দন জানালাম। এই সব প্রাণিদের বেশ কয়েকজনের তিরোধানের শতবর্ষ হয়ে গেছে। এরা আর নেই। এদের উত্তরপুরুষেরাও অনেকে প্রায় নেই, অথবা, আর নেই।

পদ্মজা নাইডু নামাঙ্কিত এই উদ্যানে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে লোকজন দেখায় মন দিলাম। প্রবেশ মূল্য মাথাপিছু ষাট টাকা। মূল আকর্ষণ চিড়িয়াখানা। গোটা একটা দিন কাটাবার পক্ষে বেশ ভাল জায়গা, যদি পর্বতারোহন বিষয়ে কিঞ্চিৎ আগ্রহ থাকে। এ নিয়ে সিনেমাও দেখান হয়। তার টিকিট আলাদা।

ইচ্ছে ছিল বিকেল নাগাদ হোটেলের পাশের রাস্তা দিয়ে হেঁটে ম্যাল রোডে উঠে একটা পাক খেয়ে ম্যালে ঢুকব। খানিকটা হাঁটার পর মনে হলো আকাশে বেশ মেঘ। চোখ তুলে দেখি সত্যিই তাই। তার একটু পরেই শুরু হয়ে গেল ইলশেগুড়ি। লোকজনের খুব একটা হেলদোল দেখা গেল না। কাছেই একটা ছোট্ট দোকানের সামনে সাউন্ড বক্স বাজিয়ে জোর নাচছিল তিন-চারটে ছেলে।

পাহাড়ি পথে জোরে হাঁটার কোন মানেই হয় না। ম্যাল রোডে পৌঁছে টের পেলাম বৃষ্টির জোর কিঞ্চিৎ বাড়ল। তিনদিন ধরে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে দেখেছি জলের পাইপ বসানর কাজ জোর কদমে চলছে। দার্জিলিং শহর দক্ষিণে যতটা ঘিঞ্জি আর হিজিবিজি, এদিকটা তেমন নয়। ম্যাল রোড বেশ নিরিবিলি দেখাচ্ছিল। বৃষ্টি কয়েক মিনিট সামান্য জোরে ঝরার পর থেমে গেল আচমকা। ইচ্ছে হল একবার ফিরে গিয়ে গভর্নর হাউজের দিকে পা চালাই, কিন্তু ফুসফুসের কথা ভেবে ক্ষান্ত দিলাম। সামনে কিশোর-কিশোরী হেঁটে যাচ্ছিল একজোড়া। কিশোরী বলছে, কিশোর শুনছে। দু-জনের পোষাকেই হরেক রঙের উপস্থিতি।

মহাকাল মন্দিরের নিচে যখন এলাম তখন মনে হল ঘেমে গেছি। আসলে যাই নি। মন্দিরটা উঁচুতে বলে সেখানে উঠে ফাঁক ফোঁকর দিয়ে নিচের দিকে তাকাতে ভালোই লাগত, কিন্তু দিনের আলো প্রায় শেষের দিকে। অতগুলো সিঁড়ি ভাঙতে ইচ্ছে করল না মোটেই। মনে পড়ল, ভোর বেলায় টাইগার হিল যেতে যেতে বসন্ বলছিল তাঁদের পিকনিক করার কথা। ছোকরা বয়সে বন্ধুদের সঙ্গে হেঁটেই চলে যেত টাইগার হিল। বসনের কৈশোর আর যৌবনের অনেকটা কেটেছে গোর্খাল্যান্ডের উত্তাল সময়ে। কোনওরকমে চাল আর মাংস যোগাড় হলেই পিকনিক। হেঁটে হেঁটেই চলে যেত তাঁরা এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে।

পরিবারের লোক সন্ধে সাতটা নাগাদ হোটেল থেকে বেরিয়ে ম্যালে এসে মিট করবে। হাতে সময় ছিল। ম্যাল যথারীতি মেজাজে। তবে জায়ান্ট স্ক্রিন অন্ধকার। এবার আমি নেহেরু রোড না ধরে পাশের রাস্তাটা ধরলাম। মোমো-পকোড়ার দোকানগুলো ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে যেতেই দেখি কেমন জানি ভূতুড়ে একটা পাড়ায় চলে এলাম বলে মনে হল। একটু পরে বুঝলাম, আসলে সব শহরেরই বড় রাস্তা আর গলি রাস্তা থাকে। আমি তেমনই একটা গলি দিয়ে যাচ্ছি। ছোট ছোট বাড়ি। সরু পথ। একটা বাড়ি থেকে স্পষ্ট পড়াশুনোর আওয়াজ পেলাম। তারপর একটা অতি ছোট দোকান। বাড়ির জানলা ভেবে প্রথমে তাকাই নি। হঠাৎ চোখে পড়ল জানলার পাশে চিপসের প্যাকেট ঝুলছে।

দোকানদার একজন কিশোর। গোঁফের রেখাও ওঠেনি ভালমত। দোকানের সব কিছুই ছোট ছোট আর অল্প অল্প। কয়েকটা চকোলেট আর একটা সিগারেট নেব জেনে দোকানদার অতি সিরিয়াস হয়ে গেল। কিন্তু চকোলেট কাগজে মুড়ে সিগারেটের প্যাকেট খুলতেই দোকানদারের বিস্ময় ছিটকে বেরিয়ে এল একটা শব্দে— 'লঃ!'

প্যাকেট ফাঁকা।

গভীর লজ্জায় সে বার বার সরি উচ্চারণ করতে করতে নিজের ভাষায় যা বলল তার মানে, সিগারেট ছিল। দুটো তো থাকবেই। কিন্তু কোথায় যে গেল তা সে জানে না।

ঠিক তখনই দোকানের ভেতরে একটি যুবতী কোথা থেকে ঢুকে পড়ল। সিগারেট তার হাতেই জ্বলছে। কিশোর তার দিকে তাকিয়ে কিঞ্চিৎ তিরস্কারের সুরে বলল, 'মা! তুমি দুটোই খেয়ে নিয়েছ? কাস্টমার কী খাবে?'

ধূমময়ী জননী সম্পূর্ণ অজ্ঞাতপরিচয় ক্রেতাকে দেখে ক্ষণিকের জন্য থমকাল। তারপর দ্রুত ভ্যানিশ হল ভেতরে। আমি তার খিলখিল হাসিটা শুনতে পারলাম। আর দাঁড়ালাম না। অনেকদিন আগে কে জানি একবার আমাকে বলেছিল, গোর্খাল্যান্ড তখনই হবে যখন পাহাড়ের মেয়েরা সবাই পথে নামবে।

খুব একটা ভুল বলে নি।

**শুভ্র চট্টোপাধ্যায়**

(আগামী সংখ্যায় শেষ পর্ব)

শ্রীমতী ডুয়ার্স

# শবরীমালা !
## নারীদের জন্য ঈশ্বরের দুয়ার আজ কতখানি অবারিত ?

রাখি পুরকায়স্থ

শবরীমালা মন্দির হিন্দুদের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান। প্রায় ৮০০ বছরের পুরনো কেরালার এই মন্দিরটি পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২৬০ মিটার উপরে একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। চারদিকে ১৬টি পাহাড় বেষ্টিত পেরিয়ার ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রের গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় শবরীমালা মন্দিরে। এই মন্দিরের আরাধ্য দেবতা বাঘে চড়া, তিরধনুক হাতে আয়াপ্পা স্বামী শৌর্যবীর্যের দেবতা। প্রতি বছর দক্ষিণের রাজ্যগুলি থেকে বহু সংখ্যক 'পুরুষ' ভক্ত ও পর্যটক শবরীমালা মন্দির দর্শনে যান। হ্যাঁ, শুধুমাত্র পুরুষরাই যেতেন, কারণ ২০১৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেখানে ১০ থেকে ৫০ বছর বয়সী মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এমনকী মন্দিরে ঢুকতে গেলে মহিলাদের বয়সের প্রমাণপত্র পর্যন্ত দেখাতে হত মন্দির কর্তৃপক্ষকে!

এখন প্রশ্ন হল, প্রাচীনকাল থেকেই যে মন্দিরে সকল বর্ণ ও শ্রেণীর হিন্দুদের সমান স্থান আছে, সেই 'অল ইনক্লুসিভ' মন্দিরে জনন-ক্ষমতাসম্পন্ন মহিলাদেরই কেবল প্রবেশ নিষেধ কেন? প্রাচীন বিশ্বাস মতে, মন্দিরটির পূজ্য দেবতা আয়াপ্পা স্বামী একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, তাই এই চিরকুমার দেবতার কাছাকাছি ১০ থেকে ৫০ বছর বয়সী ঋতুযোগ্যা নারীরা গেলে তিনি রুষ্ট হতে পারেন! সেইসাথে ঋতুযোগ্যা নারীরা প্রবেশ করলে নষ্ট হবে মন্দিরের 'পবিত্রতা'!

**সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পরেও শুধুমাত্র মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার দোহাই দিয়ে মহিলা ভক্তদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার থেকে ব্রাত্য করে রাখার এই প্রচেষ্টা আজকের 'আধুনিক' ভারতে লিঙ্গ অসাম্যের জ্বলন্ত উদাহরণ। বিষয়টা আরও বিস্ময়কর ঠেকছে, কারণ মেয়েদের ক্ষমতায়ন, সাক্ষরতা এবং অন্য নানা বিষয়ে কেরালা দেশের সব চেয়ে প্রগতিশীল রাজ্য!**

Kerala Hindu Places of Public Worship Rules, ১৯৬৫-এর Rule 3(b) অনুসারে, কেরালার যে সব ধর্মস্থানে মহিলাদের 'প্রথাগত কারণে' প্রবেশ করবার অনুমতি নেই, সেই প্রথাটি সেখানে আইনত বহাল থাকবে। ১৯৯১ সাল থেকে কেরালা উচ্চ আদালত এই বিধি-নিয়মটিকে সমর্থন করে আসছেন, যার ফলে শবরীমালা মন্দিরে প্রবেশের ক্ষেত্রে ১০-৫০ বছর বয়সী মহিলাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি থেকেছে। আর এখানেই শবরীমালা বিতর্কের সূত্রপাত!

এমন লিঙ্গ বৈষম্য দোষে দুষ্ট প্রথা নিয়ে তাই স্বাভাবিকভাবেই উঠেছে গুচ্ছ-গুচ্ছ প্রশ্ন - ঋতুমতী নারীদের অপবিত্র বলা হচ্ছে কীসের ভিত্তিতে? একটা স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে এমন অস্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার অর্থটাই বা কি? দেবালয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে নারীদের এই স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে নীচু করা হচ্ছে কোন কারণে? তবে কি নারীরা ঋতুমতী না হলেই ধরাধামের মঙ্গল হত? মানবজাতির অস্তিত্বটা টিকে থাকত তো?

*কেরলার শবরীমালায় আয়াপ্পার মন্দিরে ভক্ত সমাগম*

২০০৬ সালে ইয়াং ল-ইয়ার্স এ্যাসোসিয়েশন এই প্রথাগত নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে ভারতের সর্বোচ্চ আদালতে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে। পরবর্তীকালে এই প্রথাকে চ্যালেঞ্জ করে সর্বোচ্চ আদালতে একাধিক মামলা দায়ের করা হয়। সব মামলা একত্র করে সর্বোচ্চ আদালতের একটি বিশেষ সাংবিধানিক বেঞ্চ মামলাটি হাতে নিয়েছিলেন ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে। অবশেষে, ২০১৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর এই লিঙ্গ বৈষম্যমূলক প্রথাকে বাতিল করে সব বয়সের নারীদের জন্য শবরীমালা মন্দিরের দরজা খুলে দেন ভারতের শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ রায় দেন, ধর্মাচরণে সবার সমানাধিকার রয়েছে। মন্দিরে ঢোকার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার সমানাধিকার রয়েছে। ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে কোন লিঙ্গ বৈষম্য চলে না। ঋতুযোগ্যা মেয়েদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার প্রত্যাখ্যান করলে ভারতীয় সংবিধানের ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হবে। এছাড়া জৈবিক কারণের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্ট এধরনের লিঙ্গ বৈষম্য সংবিধানের ১৪ নং ও ১৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সাম্যের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে। এমন নিষেধাজ্ঞা অস্পৃশ্যতার সামিল (সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন) বলেও মত প্রকাশ করেছেন শীর্ষ আদালত। এই ঐতিহাসিক রায়দানের ফলে মন্দির কর্তৃপক্ষ এখন সব বয়সের নারীদেরই মন্দিরে প্রবেশ করতে দিতে আইনত বাধ্য।

ব্যক্তি জীবনের সর্বস্তরে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার দিকে এটি নিঃসন্দেহে একটি বিরাট পদক্ষেপ। এবারও নারীদের সমানাধিকারের দাবি আইনত পূরণ হল সেই বিচার বিভাগের হাত ধরেই। অযৌক্তিক সংস্কারের শৃঙ্খল থেকে অর্ধেক আকাশকে মুক্ত করল ভারতের সর্বোচ্চ আদালত। আইনজ্ঞ ও নারী অধিকার কর্মীরা আশা করছেন, শীর্ষ আদালতের এই রায়ে নারীদের সমান অধিকারের ক্ষেত্রে এক নয়া দিগন্ত খুলে যাবে। শবরীমালা মন্দিরে ঋতুযোগ্যা নারীদের প্রবেশাধিকার দেওয়ার ফলে দেশের অন্যান্য মন্দির, যেখানে নারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ, সেখানেও নারীদের প্রবেশাধিকার মিলবে বলে অনেকেরই ধারনা।

দুঃখের বিষয়, শীর্ষ আদালতের এই রায়ের পর কেরালা রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে প্রচণ্ড বিক্ষোভ। একদিকে যখন বহু মহিলা মন্দিরে প্রবেশ করবার আইনি অধিকারকে বাস্তবায়িত করবার জন্য কট্টর পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, তখন অন্যদিকে বহু মহিলা ও পুরুষ সেই অধিকারের বিরোধিতায় রাস্তায় নেমেছেন, সর্বোচ্চ আদালত সেই অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া সত্ত্বেও! বহু মহিলা মন্দিরে ঢুকতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। যারা লুকিয়ে ঢুকেছেন তাঁরা সামাজিকভাবে তিরস্কৃত হয়েছেন, তীব্র অপমানের শিকার হয়েছেন, কাটাচ্ছেন অনিশ্চিত ও অসুরক্ষিত জীবন! এই অশান্ত পরিস্থিতিতে সকল বয়সের মহিলারা নির্বিঘ্নে আয়াপ্পার মন্দিরে ঢুকতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। সব ধরনের ধর্মীয়আচারকে আইনের মাপকাঠিতে মাপা যায় কিনা সেই প্রশ্নও তুলছেন অনেকে। সব মিলিয়ে শবরীমালা রায়ের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আদালতে জমা পড়েছে ৪৯টি রিভিউ পিটিশন। নিজের রায় পুনর্বিবেচনা করতে প্রকাশ্য শুনানিতে রাজি হয়েছেন আদালত। তবে একইসঙ্গে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, যে রায় দেওয়া হয়েছে তাতে কোনও স্থগিতাদেশ দেওয়া হবে না। এখন দেশের সর্বোচ্চ আদালত কী সিদ্ধান্ত নেন, তারই অপেক্ষায় দিন গুনছেন ওয়াকিবহাল মহল।

*শবরীমালা ইস্যুতে সমাজ আড়াআড়ি বিভক্ত হয়ে পড়েছে*

**শীর্ষ আদালতের এই রায়ের পর কেরালা রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে প্রচণ্ড বিক্ষোভ। একদিকে যখন বহু মহিলা মন্দিরে প্রবেশ করবার আইনি অধিকারকে বাস্তবায়িত করবার জন্য কট্টর পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, তখন অন্যদিকে বহু মহিলা ও পুরুষ সেই অধিকারের বিরোধিতায় রাস্তায় নেমেছেন, সর্বোচ্চ আদালত সেই অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া সত্ত্বেও! বহু মহিলা মন্দিরে ঢুকতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। যারা লুকিয়ে ঢুকেছেন তাঁরা সামাজিকভাবে তিরস্কৃত হয়েছেন, তীব্র অপমানের শিকার হয়েছেন, কাটাচ্ছেন অনিশ্চিত ও অসুরক্ষিত জীবন!**

একবিংশ শতাব্দীতে নারীদের সমানাধিকারের জিগির তোলা ভারতের মাটিতে এক অভূতপূর্ব সঙ্কট ঘনিয়ে উঠছে শবরীমালা মন্দিরকে ঘিরে। সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পরেও শুধুমাত্র মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার দোহাই দিয়ে মহিলা ভক্তদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার থেকে ব্রাত্য করে রাখার এই প্রচেষ্টা আজকের 'আধুনিক' ভারতে লিঙ্গ অসাম্যের জ্বলন্ত উদাহরণ। বিষয়টা আরও বিস্ময়কর ঠেকছে, কারণ মেয়েদের ক্ষমতায়ন, সাক্ষরতা এবং অন্য নানা বিষয়ে কেরালা দেশের সব চেয়ে প্রগতিশীল রাজ্য!

যুগ যুগ ধরে মাতৃদেবীর আরাধনা করে আসা ভারতবর্ষ আজ নারীদের প্রজননশক্তির বন্দনা করবে, না বোধহীন-সংবেদনহীন ধর্মান্ধদের অনুসরণ করে তাকে ছোট করবে— সেটা আমাদেরকেই ঠিক করতে হবে। সমাজের সার্বিক উত্তরণ ঘটানোর দায়িত্ব আমাদের সবার। আরও একখানা সিঁড়ি দিয়ে উত্তরণের পথটাকে কিছুটা সহজ করে তুলল দেশের বিচার বিভাগ। কিন্তু সেই সিঁড়ি বেয়ে ওঠার কাজটা কিন্তু আমাদেরই করতে হবে। বুঝতে হবে, প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যের নামে বিভিন্ন কুপ্রথা আমাদের জাতপাতের বিভেদ এবং লিঙ্গ বৈষম্যকে স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতে শেখায়। তাই বহু বছর পিছিয়ে থাকা ধ্যানধারনা নিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে ব্যস্ত না থেকে, আমরা না হয় এবার নরদেবতাকে বসাই হৃদয়ের অন্তঃস্থলে। একে একে খুলে দিই মনের যত বন্ধ দুয়ার। পূজ্য ঈশ্বরকে পবিত্রতার সেই কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে বলি, 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও'। সেই মুক্ত জগতই এবার হোক আমাদের দেবালয়!

ইকো পর্যটন

# জংলীবাবার মন্দির

**গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য**

এক বছর ধরে জংলীবাবার মন্দির দর্শনের অভিলাষ এবং একটি রাত বেংডুবি জঙ্গল লাগোয়া হোমস্টেতে থেকে বনরোমাঞ্চ অনুভব করা। বলা বাহুল্য এসবের নেপথ্যে কারিগর আমার স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমান কৌশিকের যৌবনে তরাইয়ের বনে জঙ্গলে চা-বাগিচায় গ্রামেগঞ্জে হাটে বাজারে কম তো দাপিয়ে বেড়াই নাই। শিলিগুড়ির লাগোয়া মাটিগাড়া, শিব মন্দির, গোঁসাইপুর, বাগডোগরা ছিল একেবারেই গ্রামগঞ্জ মফঃস্বলী গন্ধমাখা নামাবলী জড়ানো জনপদ। জংলীবাবা তখনও আর্বিভাব হন নি কিংবা মাহাত্ম্য প্রচারে কেউ এগিয়ে আসেন নি। কাছেই সন্ন্যাসী চা-বাগান, পেছনে দালকা ফরেস্ট, রবি মিত্তিরের বাংলো সেখানে তো কম যাতায়াত ছিল না। নকশালবাড়ির কাছে বুড়াগঞ্জ। টুকুরিয়া ঝাড় জঙ্গলে ছোট্ট কাঠের অনবদ্য বনবাংলোটির স্মৃতি চক্ষুপটে ভেসে ওঠে। হেঁটে কত চা-বাগান যেমন কেষ্টপুর, দেওমনি, অটল, পাহাড়ঘুমিয়া, হাতিঘিষা, মেরিভিউ, অন্যদিকে কলাবাড়ি আশাপুর, বেলগাছি, মারাপুর, মানঝা, লোহাগড় চা-বাগান পেরিয়ে টিলার উপরে খয়েরবনী বনবাংলো। দূরে মেচি নদী পাহাড় অরণ্যের ধূসর চালচিত্র। বাগডোগরা থেকে কমলপুর চা-বাগান

**বাগডোগরা থেকে কমলপুর চা-বাগান সেনা ছাউনি পার হলেই বেংডুবি জঙ্গল চা-বাগান। অসাধারণ হেরিটেজ কাষ্ঠ নির্মিত বনবাংলো। জানি না আগের মত আছে কি না। ওসব কথা থাক চলুন ফিরে যাই জংলী বাবার মন্দিরে, জংলা গন্ধ গায়ে মেখে চুপটি করে বসে থাকি অরণ্যের লীলাময় রূপ রস গন্ধ স্পর্শের মধ্যে।**

সেনা ছাউনি পার হলেই বেংডুবি জঙ্গল চা-বাগান। অসাধারণ হেরিটেজ কাষ্ঠ নির্মিত বনবাংলো। জানি না আগের মত আছে কি না। ওসব কথা থাক চলুন ফিরে যাই জংলী বাবার মন্দিরে, জংলা গন্ধ গায়ে মেখে চুপটি করে বসে থাকি অরণ্যের লীলাময় রূপ রস গন্ধ স্পর্শের মধ্যে।

শিলিগুড়ি থেকে এমন কিছু দূরত্ব নয় কিন্তু ভয়ংকর যানজট ভেদ করে উড়ালপুলের উপর দিয়ে যেন উড়ে গিয়ে পড়লাম নৌকা ঘাটে। কত পরিবর্তন, কত কিছু যেন বদলে গেছে। চমকের পর চমক। শিবমন্দিরকে চেনাই যায় না। গোঁসাইপুর হয়ে বাগডোগরায় ঢুকে চক্ষু চড়ক গাছ। যেন বিলকুল অচেনা শহর, গ্রাম্যতার খোলস মুক্ত। কে বলবে একদা তরাইয়ের গভীর অরণ্যমহল বাগডোগরায় দিনে দুপুরে বাঘের গর্জন, বৃংহণ, শিয়ালের হুক্কাহুয়া রব শোনা যেত। এখন যেখানে বাগডোগরা বিমান বন্দর সেখানে ছিল গভীর শরবন, জঙ্গল। ১৫০ বছর অগে কার সাধ্যি ওখানে ঢোকার। প্রয়াত বৈদ্যনাথদা, নানুদার মুখে বাগডোগরার পুরাতন স্মৃতি কথা শুনতাম অবাক হয়ে। কেউ আর বেঁচে নেই। দুঃখ হয় ফোরলেনের গুঁতোয় দু'পাশে সবুজ বিলুপ্ত। দীর্ঘ উড়ালপুল প্রায় সমাপ্তির পথে। বিহার মোড়ে গৌর নিতাই মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কাছে দেখি কৌশিক আনাজপত্র, মাছ, মিষ্টির পোটলা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের অপেক্ষায়। তাকে গাড়িতে তুলে নিলাম। 'স্যার, চলুন জংলী বাবার মন্দিরে, কতদিন ধরে আসার পরিকল্পনা। আপনাদের নিয়ে একটু মন্দিরে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াব, স্বপ্ন সত্যি হল আজ।" মুহূর্তে মিলিয়ে গেল জনারণ্য,

শহরের কোলাহল। নির্জন বনতলী দিয়ে আমরা চলেছি জংলী বাবার মন্দিরে। গাড়ির জানালা দিয়ে বনের নির্মল বাতাস, বনজ গন্ধ অনুভব করি। শরীর মন চাঙ্গা হয়ে উঠল। যে দিকে তাকাই সবুজের হাতছানি।

অরণ্য পথে এঁকে বেঁকে আলোতে ছায়াতে, টলটলে ঘোমটা টানা, ছায়াঘন টিপুখোলা শান্ত নীরবতার মাঝে তিরতির করে বয়ে চলেছে। গাড়ি একটু দাঁড় করিয়ে টিপুখোলার সৌন্দর্য অনুভব করি।

ধীরে ধীরে যত এগচ্ছি ততই যেন পরতে পরতে বিস্ময়। সুবিস্তৃত শাল বনের মাঝে ঘণ্টার ধ্বনি তনুমনে শিহরণ জাগিয়ে তোলে। বহু প্রাচীন কড়ি গাছের ছায়ায় বসে থাকি এমন সুন্দর মোহময়ী পরিবেশ জীবনে বড় বেশি পাইনি। সবথেকে অবাক ঘরের পাশে অরণ্য ঘেরা বেংডুবি জঙ্গলের ভিতরে মন্দিরটি সত্যিই অদেখা থাকত যদি না কৌশিক আমাদেরকে টেনেটুনে না নিয়ে আসত।

"স্যার, আপনি ও কাকিমা জঙ্গলে ঘুরুন, বেড়ান, দেখুন; আমি বরং রান্নার তদারকি করি গিয়ে। তবে খুব সাবধান হাতির পাল পথ অবরোধ করে যখন তখন। তবে সব থেকে ভয় বেশি লেপার্ড ও ভল্লুক। বিষধর সাপও প্রচুর আছে এখানে।" মন্দিরে বাঁধানো বেঞ্চে কিছুটা সময় কাটাই। জংলী বাবাকে প্রণাম করি। গাছে গাছে শত শত টিয়া পাখিদের বড় কোলাহল। শালবনে যেন ওদের ঝগড়া হচ্ছে। মন্দির থেকে আমরা জঙ্গলের ভেতরে ঢুকি। ঝোপেঝাড়ে বনলতায় আকীর্ণ খণ্ডহর পরিত্যক্ত ঘরবাড়ির দৃশ্য দেখে অবাক লাগছে। জানালা দরজা বেবাক লোপাট। কাঠামোটুকু কঙ্কালের মত পড়ে আছে। একদা এখানে সেনা ছাউনি ছিল। কোনও এক জওয়ান স্বপ্নে মহাদেবের দর্শন লাভ করে এবং তারপরই সৃষ্টি হয় মন্দির। মন্দিরের ইতিহাস দেওয়ালে উৎকীর্ণ আছে ইংরাজিতে।

গাড়ির চালক অরণ্যের আনাচকানাচ ঘুরিয়ে দেখায়। বেংডুবি চা-বাগানের কাছাকাছি ভাঙা কাঠের সেতু আছে সেখানে আমরা দাঁড়িয়ে চারদিকের দৃশ্য অবলোকন করি। "স্যার, ওই দেখুন চেপাখোলা। ওখানে যাওয়া নিরাপদ নয় ওটা লেপার্ডদের আস্তানা।" প্রতিবছর নভেম্বর মাসে হাতিদের মহাসম্মেলন হয় বেংডুবি জঙ্গলে। ডুয়ার্সের হাতিরাও তখন যোগদান করে। তরাইয়ের বনে জঙ্গলে পরিক্রমা করে আবার তারা ফিরে যায়। মাঝে মাঝে ওদের দেখা যায় কেষ্টপুর নেপাল সীমান্তে। শেষ রাতে জংলী বাবার মন্দিরের পাশ দিয়ে ওরা ফিরে যায় নিজ আস্তানায়। অদ্ভুত ব্যাপার হাতিরা আজ পর্যন্ত মন্দিরের কোনও ক্ষতি বা অনিষ্ট করে নি।

এবারে চলুন বেংডুবি হোমস্টে-তে। পটে আঁকা ছবির মত পরিচ্ছন্ন বনবস্তি ধানখেতের ভেতর দিয়ে পৌঁছে যাই বেংডুবি হোমস্টে-তে। উফ্! ফাটাফাটি অ্যাম্বিয়েন্স, দেখা মাত্র আমার পছন্দ হয়ে যায়। ভীষণ নিরিবিলি শান্ত-নির্জন পরিবেশ। পাখির কলরবে মুখর। এবারে আমরা ডানহাতের কাজটা সেরে ফেলি। ডাল, ভাত, মাছের ঝোল, শেষ পাতে রসগোল্লা। কৌশিক খুব খুশি। বলে স্যার এখানে কয়েকটা দিন আপনারা থাকুন। আমাদেরও তো সে রকমই ইচ্ছে। শহরের কোনও কোলাহল এখানে নেই পরম শান্তি। হোমস্টে-র কিছুটা জায়গা ইলেকট্রিক তার দিয়ে ঘেরা কারণ হাতি যখন তখন বিনা নোটিশে চলে আসে। ধান বা ফসল পাকলে ওদের আনন্দ দেখে কে। নজর মিনারে বসে ঢ্যাড়া পেটানো, পটকা ফাটানো, চেঁচামেচি কোনও কিছুই গ্রাহ্য করে না। মহা আনন্দে পাকা ধান সাবাড় করে।

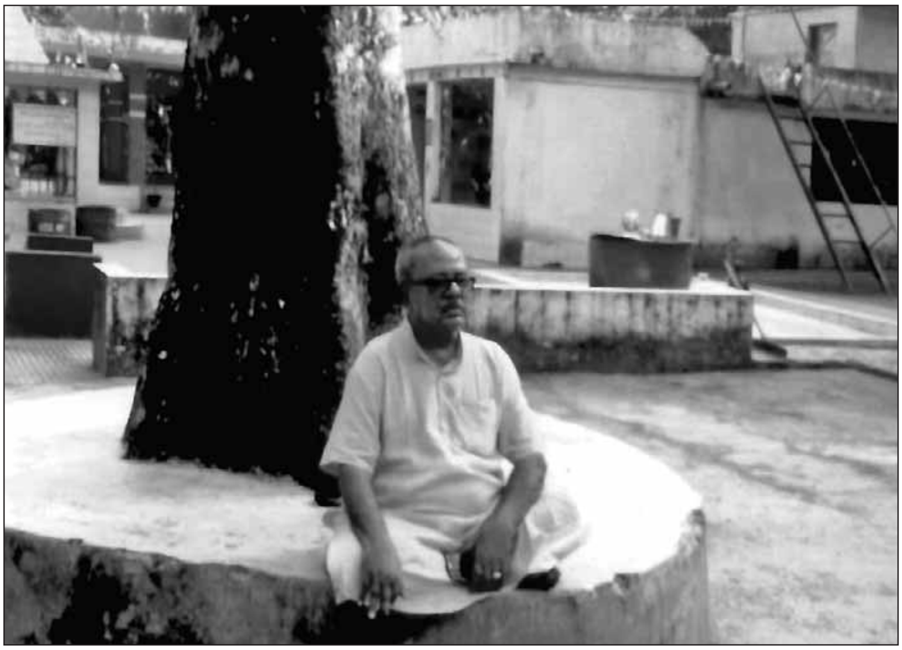

**পটে আঁকা ছবির মত পরিচ্ছন্ন বনবস্তি ধানখেতের ভেতর দিয়ে পৌঁছে যাই বেংডুবি হোমস্টে-তে। উফ্! ফাটাফাটি অ্যাম্বিয়েন্স, দেখা মাত্র আমার পছন্দ হয়ে যায়। ভীষণ নিরিবিলি শান্ত-নির্জন পরিবেশ। পাখির কলরবে মুখর। এবারে আমরা ডানহাতের কাজটা সেরে ফেলি। ডাল, ভাত, মাছের ঝোল, শেষ পাতে রসগোল্লা। শহরের কোনও কোলাহল এখানে নেই পরম শান্তি। হোমস্টে-র কিছুটা জায়গা ইলেকট্রিক তার দিয়ে ঘেরা কারণ হাতি যখন তখন বিনা নোটিশে চলে আসে। ধান বা ফসল পাকলে ওদের আনন্দ দেখে কে।**

ভোজন পর্ব সেরে দোতলায় উঠে পড়ি। আপাতত অতিথিদের জন্য দু'খানা রুম, নিচে খাবার ঘর, রান্নাঘর এবং ম্যানেজারের ঘর। দোতলার বারান্দায় বসে দেখছি পশ্চিম দিগন্তে বলাকারা ডানা মেলে উড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে ধনেশের হাঁকাহাঁকি। সম্মুখের গাছে বসে ঠোঁট ঘসছে আবার উড়ে চলে যাচ্ছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকাদের কান্না, ঘন্টি পোকাদের বাজনা শুনতে শুনতে চোখ বুজে আসে। ধন্য আমি ধন্য হে! পাগল তোমার জন্য হে। আমার প্রিয় বেংডুবি হোমস্টে, জংলী বাবার মন্দির।

যদি কেউ যেতে চান তাহলে এই নম্বরে অবশ্যই যোগাযোগ করুন, ৯৭৭৫১৮০৩০৯।

# চাঁদের কাছাকাছি

সাগরিকা রায়

চাঁদ আমার ভারি প্রিয়। ডুয়ার্সের এক চাঁদ ছুঁয়ে যাওয়া সোমবারে আমার জন্ম। জলজঙ্গল, বৃষ্টি, চারপাশে চা বাগানের সুগন্ধ... এর মাঝখানে এসে হাজির হলাম। জানতাম না এর বাইরেও পৃথিবী আছে! সবে দাঁড়াতে শিখে দু'পা হাঁটার চেষ্টা করছি, অমনি প্রাইমারি স্কুলের স্যার একটি বই উপহার দিলেন। নাম— টুকটুকে বই। সে বইতে কী ছিল, কারা ছিল, কিচ্ছু জানার ক্ষমতা ছিল না। অথচ বিষম অহং বোধ নিয়ে সেটি সবসময় নাকি সঙ্গে রাখতাম। কেউ খ্যাপাতে চেয়ে বই ধরে টান দিলে সাঙ্ঘাতিক চিৎকার করতাম। স্বভাবটা এখনও আছে। বইকে ভালবাসার শুরু সেই টুকটুকে বইটি থেকেই! একটা সময় পড়াশোনার শুরু হল মায়ের কাছে। রান্নাঘরের বারান্দায় পরিপাটি হয়ে জলচৌকির ওপর স্লেট রেখে পিঁড়িতে বসেছি। স্লেটের ওপর মায়ের হাতের হ্রস অ-এর ওপর দিয়ে চক বুলিয়ে যাচ্ছি। আর মুখে উচ্চারিত হচ্ছে সেই বর্ণের নাম-স রে অ... অ...! আমার পড়াশোনা দেখে কৌতূহলী আমগাছের পাতায় জমে থাকা শিশির থাকতে না পেরে পড়ল এসে মাটিতে —টুপুস !

স্কুলিং শুরু হল। মর্নিং স্কুল। সকাল ছটায় বাড়ি থেকে হেঁটে মেইন রোড পেরিয়ে জুবিলি ক্লাব, দুর্গাবাড়ি, তারপর এক বিশাল তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে স্কুলে যেতাম। প্রথম কিছুদিন সঙ্গে বড় কেউ ছিলেন। পরে নিজের দায় নিজেকে নিতে হল। এভাবে আস্তে আস্তে মানুষ বড় হতে শেখে। ভোরে তেমন যান চলাচল ছিল না। দোকান খুলে যদুর ছেলে গঙ্গাদা ব্যবসায় মনোনিবেশ করেছে। মাঝে মাঝে ওখান থেকে দিস্তা কাগজের দুটো পৃষ্ঠা কিনতাম। ক্লাস টেস্ট আছে। দশ পয়সায় একমুঠো লিলি বিস্কুট। আমার সবুজ কার্ডিগানের ছোট পকেটে বেশ সেঁটে যেত তারা। সেই তেপান্তরের মাঠের ওপারের চা বাগান তখন ঘুমে বিভোর। ওর তো আর সাত তাড়াতাড়ি ক্লাসে যেতে হয় না! দিদির সাদা ওড়নার মত কুয়াশা গায়ে জড়িয়ে রি রি কাঁপছে। ঝাপসা দেখতে পাচ্ছি বড় বড় গাছের ফাঁকে নানী এত্তো মোটা শরীর নিয়ে ঘাস কাটতে যাচ্ছে। ধবধবে ফর্সা নানীর সঙ্গী তার লিকলিকে ছেলে। একটা সরু পায়ে চলা রাস্তা দিয়ে ওরা কোথায় চলে যেত,আমার জানতে ইচ্ছে হত। কিন্তু ওদিকে জনগণ-র বেল পড়ে গিয়েছে। মোট সাতটি গান গাইতে হত প্রার্থনার সময়। বন্দে মাতরম দিয়ে শুরু, হও ধরমেতে, এদেশ এদেশ, ধনধান্য, কাকাতুয়া কাকাতুয়া... শেষ হত জনগণ দিয়ে। এখন বিশ্বাস না হলেও আমি খুব নিরীহ ছিলাম ছোটবেলায়। সেই জন্যই স্যারেরা দিদিমণিরা আমাকে ভালবাসতেন। মনে আছে দুজন বেশ কৈশোর অতিক্রম করে যাওয়া

## ডুয়ার্সের মেয়েবেলা

**ক্লাস টু। ভক্তদাস সিগারেট খেতে খেতে মানে টানতে টানতে এল। সুনীলও। সঙ্গে উদ্দাম টুইস্ট- মুখে হিন্দি গান— এইসা মওকা ফির কাঁহা মিলেগা...। মুরারি স্যারকে কেউ খবর দিয়েছিল কিনা জানি না, স্যার এলেন মোটা বেত নিয়ে। এমন অনাচার ক্লাসে? ভক্তদাস আর সুনীল তাড়াতাড়ি নিজেদের সীটে গিয়ে বসেছে। ওদের ব্যাগ হাতড়ে স্যার বের করলেন এক গাদা সিগারেট।**

ছেলে ক্লাসে ছিল। আমরা সবে বাল্যকে উপভোগ করছি, তখন বাইরের জগতকে আমাদের সামনে নিয়ে এল সুনীল, আর ভক্তদাস। ক্লাস টু। ভক্তদাস সিগারেট খেতে খেতে মানে টানতে টানতে এল। সুনীলও। সঙ্গে উদ্দাম টুইস্ট- মুখে হিন্দি গান— এইসা মওকা ফির কাঁহা মিলেগা...। মুরারি স্যারকে কেউ খবর দিয়েছিল কিনা জানি না, স্যার এলেন মোটা বেত নিয়ে। এমন অনাচার ক্লাসে? ভক্তদাস আর সুনীল তাড়াতাড়ি নিজেদের সীটে গিয়ে বসেছে। ওদের ব্যাগ হাতড়ে স্যার বের করলেন এক গাদা সিগারেট। ভক্তদাস দাঁত বের করে তাকাল— একলা খেতাম না স্যার। ক্লাসের সবাইকে দিতাম। বেতটা বাতাস কেটে ওপরে উঠতেই সুনীল চেঁচাল, ওগুলা ছিগারেট না ছার। লজেন।

স্যার তখন একটি করে লজেন পরীক্ষা করে ভেঙে ভেঙে দিলেন সবাইকে। দারুন ছিল খেতে। একটু পিপারমেন্টের গন্ধ। কিন্তু এক ভবিষ্যত-জ্ঞানী বোদ্ধা লজেন খেল না। সে বলল, নকল সিগারেটের মত দেখতে লজেন্স খেতে খেতে আসলটা খেতে ইচ্ছে করবে। বাবা বলেছে। একথা শোনার আগেই আমার লজেনটা খাওয়া শেষ। খুব ভয়ে ভয়ে আছি। ইচ্ছেটা চাগাড় দেওয়ার সময় পেরিয়ে গেছে কিনা...! ইনজুরিয়াস টু হেলথ... কথাটা ভুলি কী করে! কথাটা মিথ্যে নয়। সত্যি ইনজুরিয়াস! ভক্তদাসকে দেখলাম ক্লাস থ্রিতেই বিয়ে করে চায়ের দোকান দিয়েছে চৌপথিতে। আমাকে নেমন্তন্ন করেনি। কাদের যেন করেছিল। শুনেছিলাম বৌভাতে লাউঘন্ট খাইয়েছিল। একথাটা বাড়িতে এসে বলেছি কি, অমনি আমার জেঠিমা নাক কুঁচকে বলে উঠেছে— অ মা! অত লাউ পাইল কই? আর সুনীলকে দেখেছি অনেকদিন পরে। এক পেট্রল পাম্পে। সেখানে নোংরা গেঞ্জি পরে দাঁড়িয়ে খুব বকুনি খাচ্ছে এক ভদ্রলোকের কাছে। ওই সিগারেট লজেন্স খেয়ে খেয়ে ওদের স্বভাব খারাপ হয়ে আসল সিগারেট খেত ঠিক। নইলে ...! হুঃ! কত কথা বলতে পারি না!

আস্তে আস্তে বড় হতে হতে দেখছি দিনকাল দ্রুত পালটে যাচ্ছে। মিসায় আটক শব্দবন্ধ কানে আসে। খুব ভয় শব্দটাতে। এরই মধ্যে ডুয়ার্সের বাজারে জোর গুজব ছড়াল— ফের যুদ্ধ হবে। একজন বিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবুর চেম্বারে বসে জানাল— মাসখানেকের মধ্যেই...! সবাই সাবধান! বলতে বলতে আকাশে প্লেনের আওয়াজ। চিৎকার চেঁচামেচি করে সভ্যেরা সব ছুট নিজের নিজের বাড়ির দিকে। সব বাড়ির দরজা জানালা ফটাফট বন্ধ হয়ে গেল। কার খেয়াল হল, গোপলা বাড়ি আসেনি! আসেনি মানে গোপলা শেষ! হাউহাউ কান্না— গোপলা রে... কত ভালবাসতি পিঠে খেতে... এবারে বলেছিল চালের পিঠে খাবি...! কেউ কেউ দ্রুত মাড়োয়ারির দোকানে গিয়ে পঞ্চাশ মণ চাল কিনে ফেলল। কে না জানে যে যুদ্ধের সময় চাল পাওয়া যায় না! সব চাল মিলিটারিরা খেয়ে ফেলে!

আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে জনা ছয়েক লোক কেমন চোঙাপানা প্যান্ট পরে, শার্টের হাতা গুটিয়ে গুটিয়ে অনেকটা ওপরে তুলে বেকার বাইসেপ দেখানোর চেষ্টা করতে করতে যেত। সদ্য যুবতীরা ঠারে ঠোরে ওদের দেখে অদ্ভুত ভাষায় একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করতো— কঃ সঃ? ইটেই ছিটিলেদের চিটিনিতে পিটারতেছিটি নিটা। তখন ট বর্ণ দিয়ে কথা বলা চালু হয়েছে। কথাটার অর্থ— এই ছেলেদের চিনতে পারছি না। একদিন বেঁটেখাটো ছেলেটি তার শক্ত মুখ ফিরিয়ে বলে উঠল-ইটামি টিতপু। ইটামরা মিটস্তান।

ব্যস! সব মহিলা ভাষাবিদরা ছুটে পালাল। মস্তান এরা? বাপরে! খবরের কাগজে নাকি মস্তান শব্দটা বলা হচ্ছে। মস্তান এরকম দেখতে হয়? হুবহু মানুষের মতই তো! পরে জানা গেল গুইটামি টিতপু, মানে আমি তপুর অনেকগুলো বোন রয়েছে। তাদের থেকে তপু ট দিয়ে কথা বলা শিখে নিয়েছে। বলেছিলাম আমি খুব নিরীহ ছিলাম। এবং যাকে বলে ভিড়ে মিশে থাকা চেহারা। লিকপিকে রোগা, চাইনিজ ছাঁট দেওয়া বাচ্চা মেয়েটিকে কেউ পাত্তা দিতনা। কত গুপ্ত খবর আমার সামনেই বড়রা আলোচনা করে ফেলেছে! অমুকের বর নাকি তমুককে ভালবাসে, অমুকে আসলে দেওরের সঙ্গে, ওই বাড়ির মেয়ে পাশের বাড়ির তেনার সঙ্গে প্রেম কর্চ্ছে! এসব যখন থেকে বুঝতে চেষ্টা করতে শুরু করেছি, ত তদিনে গল্পের বইএর বন্ধ হয়ে উঠেছি। কত কত বই যে পড়লুম! ক্লাস ফাইভে উঠে দিদির বালিশের পাশে পেলাম কিরীটি। রাত জেগে কী পড়ছে দিদি? পড়ার সময় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল চোখ মুখ! দাদা হ্যারিকেনের আলো নিভু নিভু করে শোনাল —পদ্মদহের পিশাচ! এটাই সেই টুকটুকে বইএর বড়দা নাকি রে?

কাঠের দোতলার বারান্দায় পা মেলে বসে নীহাররঞ্জন গুপ্ত পড়ছি। কিছুতেই ইদানিং শব্দের অর্থ

বুঝতে পারছি না। ধুর, কী এটা? অবশেষে শোনা কথা প্রয়োগ করলাম বুদ্ধির মাথায়। ছাপার ভুল। হুম! আসলে ইন্দ্রাণী হবে। কিন্তু ইন্দ্রাণী শব্দ সেখানে মোটেও যাচ্ছে না! অস্বস্তি রয়েই গেল। ওটা আপাতত পকেটে রেখে গল্প শেষ করলাম। কাউকে জিগাসা করে জেনে নিতে গেলে নীহাররঞ্জন পড়া ঘুচে যাবে, সেটা বেশ বুঝেছিলাম। এরপর এই চোরা স্বভাবে প্রসাদ, উল্টোরথ, নবকল্লোল, ঘরোয়া, আনন্দবাজার পূজাবার্ষিকী, দেশ শারদীয়া সংখ্যা পড়াটা আমার কাছে জলবৎ তরলম হয়ে গেল। সেই বারান্দা আর আমি একাত্ম হয়ে গিয়েছি। সব বাঁয়ে হাথকি খেল। এর মধ্যে আমার জেঠিমার বাড়িতে ভজাদা এল। আমি জানতাম লোকটা ছেলেধরা। পকেটে চাকু আছে। এই মহান খবর কে রটিয়েছিল, মনে নেই। কিন্তু ভজাদার সম্মুখীন হতাম না মরে গেলেও। দাদার মেডিক্যাল স্টোর্সের দেখাশোনার জন্য সন্তোষবাবু নামে একজন প্রৌঢ় ছিলেন। কীভাবে রাণাঘাট থেকে উনি ডুয়ার্সে গেলেন, সে তথ্য না হয় কোনও ইতিহাসবিদ দেবেন, ও আমার জানার কথা নয়। তো উনি এক সময় ছেলেকেও সেই সুদূর ডুয়ার্সে নিয়ে এলেন। সেই ছেলেই ভজাদা। জেঠিমার বইএর দোকান গ্রন্থভারতীর উনিই একাধারে মালিক কাম কর্মচারী ছিলেন। এতদিনে আমি বুঝে গিয়েছি ভজাদা আসলে ছেলেধরা নয়, সে হল আলিবাবার রত্নগুহার মালিক। মর্নিং স্কুল করে বাড়িতে এসেই ভজাদার দোকানে গিয়ে হাজিব— ভজাদা, তুমি খেতে যাও। আমি দোকানে আছি। ভজাদার দোকানে খুব বিক্রি ছিল বলে মনে হয় না। সে সময়ের ডুয়ার্সে কটা লোক বই কিনে পড়ত কে জানে। দোকান বিকেলের আগে পর্যন্ত ফাঁকাই থাকত। ভজাদা আমার হাতে রত্নগুহার ভার দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য হাঁপ ছাড়তে বের হতেন। আমি এবারে স্বমূর্তি ধরতাম। শুরু হল বই পড়া। সে ছিল আমার জীবনের স্বর্ণযুগ! ভগবান আমার জীবনের সামনে একটি দরজা খুলে দিলেন— যা পাবি, লুটে নে!

একটা কথা আছে। যদি তুমি মন থেকে কিছু চাও, সারা জগৎ তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে। এটা কি শাহরুখ খানের ডায়লগ! হুম, সেটাই মনে হচ্ছে। যাক,আমার বান্ধবীর বাড়িতে ছিল ছোটখাটো লাইব্রেরি। সেটাও আমার সামনে এল সোৎসাহে, পড়। কেউ আর আলমারি খুলে দেখে না।

ছোট থেকে পুতুল খেলেছি বিস্তর। বই পড়েছি আরও অনেক অনেক বেশি। একটু করে বড় হচ্ছি,আর বাধা নিষেধের গন্ডীতে আটকে পড়ছি। ইচ্ছে হলেই ভজাদার দোকানে বসে বই পড়তে পারি না। ইচ্ছে হলেই মেইন রোড ডিঙ্গিয়ে বান্ধবীর বাড়িতে যেতে পারি না। তখন বাড়িতে বসে বই পড়া শুরু হল। বই কিনতে চলে গেলাম জলপাইগুড়িতে। দুটো বিগ শপার ভর্তি বই কিনে বাড়িতে এলাম।

এক আলোময় জীবন পার করে এসেছি। ডুয়ার্সের সেই খোলা আকাশ, শিবমন্দিরের আরতির শব্দ, অনেক দূরের কাদের মেয়ের কচি গলায় গানের রেওয়াজের সেই সন্ধে মনে পড়ে। চাঁদনী রাতে মায়ের সঙ্গে হাঁটতে বের হতাম। হেঁটে হেঁটে মায়াদির বাড়িতে যেতাম। সেখানে গল্পের আসর বসত। পানের বাটা টেনে বসত মায়াদি। যখন ফিরে আসছি, ভাই বলল, ওই দেখ, চাঁদটাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসছে।

তাকিয়ে অবাক। তাই তো! চাঁদ আসলেই আমার খুব কাছাকাছি থাকতো সেই ডুয়ার্সে। এখন আমি থাকি চাঁদের কাছাকাছি। কেউ কাউকে ভোলে না। মেয়েবেলা এক চাঁদনি রাতের স্বপ্ন যে!


MADHYA PRADESH

Date of Journey : 15/10/19 (Ex-NJP/NCB) 13 DAYS

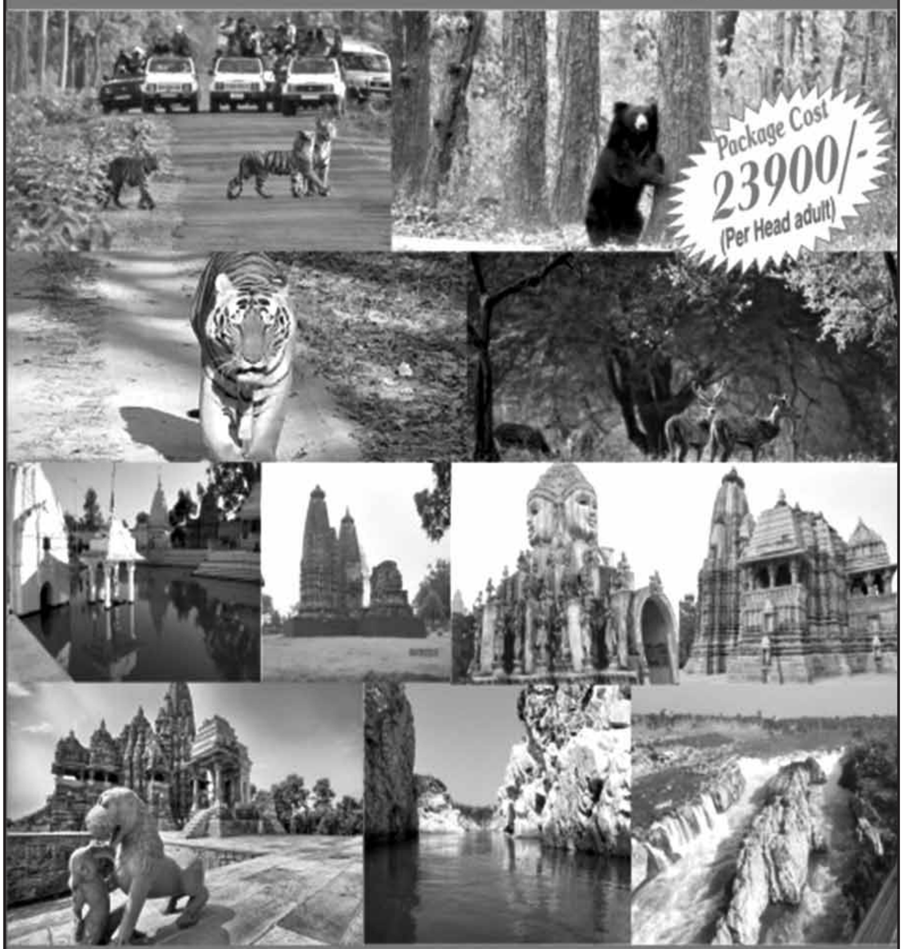


BANDHAVGARH NATIONAL PARK, KANHA NATIONAL PARK, KHAJURAHO TEMPLE, AMARKANTAK - NARMADA KUND, JABALPUR MARBLE ROCK ETC

HOLiDAYAAR

Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri

M : 9434442866 / 9002772928

Phone : 0353-2527028

E-mail : holidayaar.nb@gmail.com

# মহারাণী কথা

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

**রবীন্দ্রনাথ সুনীতিদেবী, সুনীতিদেবী রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি, সম্পর্ক, আত্মীয়তা সবটাই সম্রাজ্ঞীর চোখে এক নতুন দিগন্ত। এ যেন পরম দায়িত্ব রাজনগরের, মহারাণীর কতখানি তীব্রতা আবেগ কতখানি বন্ধুত্ব,আগ্রহের জায়গায় রবীন্দ্রনাথ এ আবিষ্কার যেন মহারাণীকে নতুন করে তুলে ধরে সম্রাজ্ঞীর কাছে, সম্রাজ্ঞীর বন্ধুদের কাছে, অন্যান্য জায়গা থেকে কলেজে অধ্যাপনা করতে আসা অধ্যাপকদের কাছেও যেন নতুন দিগন্ত উন্মোচন। এবারের পঁচিশ তাই সম্রাজ্ঞীর কাছে নতুন, অন্য ভাবনার, ভিন্ন চিন্তনের, রাজীব মিত্র এক অদ্ভুত আশ্লেষে পূর্ণতা দেখেন কন্যার মধ্যে। রাজনগরের নারী শিক্ষার প্রকৃত আলোকবর্তিকা কি বেড়ে উঠবে, জ্বলবেই লেলিহান দীপ!**

হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে মা। কলেজের সাম্মানিক পরীক্ষায় দারুণ রেজাল্ট করা মেয়েটা একটু বিব্রত। বাবা চুপ করে এক প্যাকেট অবাক সন্দেশ হাতে করে এনেছে, মা তো রান্নাঘরে ব্যস্ত, গলায় গান নেই তো কী, রিনরিনে গলার আবৃত্তির স্বর তো আছে। যারাই আজ আসছে সোহাগিনীর কথা গল্প, সেই স্কুলবেলাও বাদ যাচ্ছে না। শাশুড়ি মা থাকলে কত আনন্দ পেতেন আজ, সে সব গল্প ঝকমক করছে শব্দ উচ্ছৃঙ্খলে। রানি এখন রাজীবের কাছে বসে সুনীতি একাডেমির শতবর্ষ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পর্ব, তারপর অনুষ্ঠানের কথাগুলো বসে বসে শুনছে। আর স্মরণিকা বিষয়ক নানা আলোচনা চুপ করে বুক ভরা এক অভিমান নিয়ে গিলে নিচ্ছে। কারা লিখবে, টুকরো সব কথাবার্তা রাজীবের সঙ্গে বসে আলোচনা করছেন ড. সুরঞ্জন বসু, অধ্যাপক কোচবিহার কলেজ, আর কোন একজন প্রাক্তন শিক্ষিকা কেউ এসেছেন, যার আসার আভাস পাওয়ামাত্রই রানি উঠে ভিতর বাড়ি। সম্রাজ্ঞীর ডাক সেখানে পড়ে নি। রাজীব তাকে ডেকে বিব্রত করবেন না তা রানি জানে। আসলে শতবর্ষের অনুষ্ঠান হয়ে গেছে অনেকটাই। স্মরণিকা প্রকাশ শেষ পর্যায়ে। তাই এত দেরি।

রানি কলতলা হয়ে বাথরুমে ঢুকে যায় ধীর পায়ে। মাথাটা অকারণেই ভার লাগে। ড. সুরঞ্জন বসুকে রানি কাকুই বলে। কাকু যথারীতি বেশ জোরের সঙ্গেই ওর রেজাল্টের প্রশংসা করেছে। তখন কি সেই দিদিমণি সেখানে ছিলেন? কী জানি, বাবা জানবেন। মাথা থেকে টুকরো কুটোর মত ফেলে দিতে চাইলেও কুটোটি নড়ে না।

***

সুনীতি একাডেমি। নামটার মধ্যেই আভিজাত্য। স্কুলটার ধুলোয় সবুজ মাঠে, প্রার্থনা সভার হলঘরে পিছনের টিফিন ঘরের সামনের ক্লাস ভিত্তিক লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, চিলের ধারালো ঠোঁট এসে টিফিন ছিনিয়ে নেওয়া কিংবা হাত বা মুখে জখম নিয়ে বাড়ি ফেরা কিংবা খেলার মাঠের নিত্য নৈমিত্তিক ড্রিল কিংবা এনসিসির প্যারেড, সব মিলে কখনও রানি ভাবেই নি স্কুলটা থেকে একদিন ওকে অনেক দূরে নির্বাসনে যেতে হবে। স্কুলের রাস্তা বদলে যাবে। একটু অকালপক্ক, কল্পনাপ্রবণ, আদুরে মেয়ে রানির সিক্স সেভেন এইট জুড়ে ঝমঝমে ঝকঝকে রেজাল্টে রাজীব মিত্রও কি ভেবেছিলেন রানির ফাঁকিবাজি চূড়ান্ত মাত্রার। মিথ্যেকথা বলতে শিখেছে, ক্লাসে অঙ্ক না পেরে, না বুঝে জমিয়ে রাখতে রাখতে পিছিয়ে পড়ছে। রাজীব অফিস আর ক্লাবের ব্যস্ততায় খাতা মেলানোর সময় পেতেন না। রানি পেছোচ্ছে ক্রমে। মহারাণীর স্কুলের প্রথম সারির মেয়েটা, সবকিছুতে এক নম্বর, উৎসাহে সবার আগে, পড়াশুনোয় জীবনবিজ্ঞান, বাংলা টানছে। ইংরেজিও কম বেশি, টানছে না ফিজিক্যাল সায়েন্সের বকযন্ত্র, অঙ্কের দুর্বিষহ সংখ্যাগুলো এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে, চোখে সর্ষেফুল হয়ে যায়। কিচ্ছু বোঝে না, বাড়িতে নতুন মাষ্টারমশাই। তিনিও অর্ধেক সময় অঙ্ক বুঝিয়ে বুঝিয়ে করেই দিচ্ছেন, রানি তাকিয়ে আছে, তার ভেতরটা ফাঁকা। নিচ্ছে না। কিচ্ছু থাকছে না, বসছে না। মাষ্টারমশাই চলে গেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে যেন। ব্যস, হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় লাল সংকেত। অঙ্কে ভীষণ কম। অভিভাবক জানলেন, শুনলেন এভাবে চললে বার্ষিক পরীক্ষায় ডাব্বা নির্ঘাত। খুব অপমানিত মুখ মায়ের। রাজীবের অসহায় মুখ তখন কেমন যেন! রানি দেখেও দেখছে না, বুঝেও বুঝছে না। উড়ু উড়ু মনের মেয়েটার ফরসা গালে তখনই কে যেন ছুঁয়ে দিয়েছিল লালচে আভা। সে তখন কল্পদেশে রাজপুত্র। সে রাজপুত্রের মুখও অস্পষ্ট। বইয়ের পৃষ্ঠার অক্ষরগুলো কেমন পিঁপড়ের হেঁটে যাওয়া মিছিল। তবু ভাল লাগা বিষয়গুলোর শিক্ষিকার গায়ের গন্ধ শাড়ির আঁচলে আর ভালবাসায় নিজের মত ভাল লাগতো। কিন্তু অঙ্ক! হায়রে হায়! মহারাণীর স্কুলে এমন দিদিমণিও থাকেন! যিনি সারাক্ষণ ছাত্রীদের দিকে পিছন ফিরে কালো কালো আঙুলে উৎসাহ সৃষ্টি করতে না পারা বেদম বিশ্রি চকের আঁকিবুকি টানেন আর অক্ষরে অতি জটিল অঙ্ক এমনকি সরল অঙ্ককেও জটিল করে তুললেন। ব্যস যেটাই ভাল না লাগা সেটাই সরিয়ে রাখতে রাখতে ডাব্বা খাওয়া কে আটকায়!

রানির বার্ষিক রেজাল্ট কারোই যেন বিশ্বাসযোগ্য লাগছে না, বাড়ি জুড়ে থমথমে পরিবেশ। রানি কেমন সিঁটিয়ে থাকছে, পরিবার পরিজন পাড়া সবখানে। না অতটুকু

মেয়ে বাইরে যাবে না। ফুঁপিয়ে কান্নাটা গলা পর্যন্ত এসে কেমন ভয়ে ভাবনায় থমকে আছে। রাজীব মিত্রের স্বপ্নের দরজা কে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। সুনীতি একাডেমির চৌহদ্দির ভিতর রাজীব নিজে পা না রাখলেও সোহাগিনীকে যেতে হল কয়েকবার। সম্রাজ্ঞীর চোখের জল বিন্দু বিন্দু আগুন তৈরি করতে থাকে। বাবার মুষড়ে পড়া আর মা'র অপমান আর সে সহ্য করতে পারে না। হাপুস নয়নে কাঁদে একা সকলকে লুকিয়ে। রাজীব তাকে আর সে স্কুল পথ মাড়াতে দেন নি। মেয়ের শরীরে মনে কোথাও কলঙ্ক আঁচ ফেলতে দিতে চান নি। কোথায় কোনপ্রান্তে নিয়ে যাবেন, কোথায় আছে এর সমাধান বুঝতে পারেন না। অবশেষে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা করেও ফেলেন। তারপর একদিন শহর ছেড়ে দূরে কোন নগরীর দিকে চলল রানি বাবা-মার সঙ্গে। তখন ও জানে না, বোধগম্য হচ্ছে কি হয় নি বোঝা যায় না। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে! নগরী, মহানগরী, সেখানকার ধুলো ধোঁয়া গাড়ির আওয়াজ। হাঁটতে গেলে একশো বাধা। জায়গা চিনে চলা দুষ্কর। এমন পরিস্থিতিতে সেই মানুষই মেয়ের জন্য শহর ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। সেই ভূমি ছাড়া করতে চাইছেন মেয়েকে যে ভূমি তাঁর প্রাণ প্রিয়।

সিস্টার নিবেদিতা মিশন স্কুল, অত্যন্ত পুরনো। পায়ে পায়ে মা'র হাত ধরে সদ্য চোদ্দ পেরোনো মেয়েটা অন্য এক পুরনো ঐতিহ্যের সামনে দাঁড়ায়। আর সম্রাজ্ঞীর রেজাল্ট দেখে উচ্ছ্বাস গলায় না এনেও বললেন, সব বিষয়েই এত ভাল...শুধু অঙ্কের জন্য.., ঠিক আছে, ওখানকার পুরোনো স্কুল। ঐতিহ্যবাহী স্কুলের মহীতোষবাবু ফোন করেছিলেন। আপনারাতো রাজার শহরের, আর মহারানী সুনীতিদেবী শুনেছি বেশ ক'বার এসেছেন আমাদের স্কুলে অতিথি হয়ে। এই দেখুন ছবি। ফাউন্ডার মেম্বারদের তিনিও একজন। ভীষণ ভালবেসে প্রজ্ঞাপারমিতা মহাপ্রাণা প্রধান শিক্ষয়িত্রী কাছে টেনে নিয়েছিলেন সম্রাজ্ঞীকে। তারপর তো বদলের ইতিহাস। রাজীব মিত্রের আর সঙ্গে সোহাগিনীর কতবার এ শহর থেকে নগরের দিকে যাতায়াত। অভ্যস্ত পা সোহাগিনী যেন রানিকে তৈরি করার মন্ত্রেই দীক্ষা নিয়েছেন। নিজের কণ্ঠস্বরের জাদুকরী ক্ষমতা, নাটকে অদ্ভুত অভিনয় সব যেন কোন গত জন্মের স্বপ্নের মত রাজনগরের দিনগুলোয় ফেলে এলেন। রাজীব বহুদিনের ক্লাব,সংস্থা এগুলোতো ছাড়তে পারেন নি! ধরে রাখার স্বপ্ন কারিগর তিনি। নাটকের ক্লাস,অফিস ক্লাব আবার তৎকালীন ক্রীড়ামোদী মানুষের ভালোবাসার খেলাগুলোর পরিচালকও তিনি। সবচেয়ে বড় কথা রানির পড়াশুনো, সংসার সবটা চালাতে চাকরিটাতো আর খোয়াতে পারেন না! সুতরাং ছড়িয়ে গেল সংসার এপ্রান্ত ওপ্রান্তে। মহানগরীর ছুঁয়ে থাকা জলে সম্রাজ্ঞী হয়ে উঠছে তখন নতুন। নতুন চোখ, নতুন সংলাপ নতুন নিয়মের মানুষ। আসলে সুনীতিদেবীর শৈশব থেকে কৈশোরকাল তারপর আবার পট পরিবর্তন... শিক্ষাকাল শেষ করে বাবার সান্নিধ্যে বড় হয়ে উঠে, মহারাজের শিক্ষাকাল পর্যন্ত অপেক্ষা আর বসবাস, প্রেমের গুঞ্জরণ— কোথায় যেন সম্রাজ্ঞীর জীবন অধ্যায়ে মিলে দুলতে থাকে।

**মহারাণীর স্কুলের প্রথম সারির মেয়েটা, সবকিছুতে এক নম্বর, উৎসাহে সবার আগে, পড়াশুনোয় জীবনবিজ্ঞান, বাংলা টানছে। ইংরেজিও কম বেশি, টানছে না ফিজিক্যাল সায়েন্সের বকযন্ত্র, অঙ্কের দুর্বিষহ সংখ্যাগুলো এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে, চোখে সর্ষেফুল হয়ে যায়। কিচ্ছু বোঝে না, বাড়িতে নতুন মাষ্টারমশাই। তিনিও অর্ধেক সময় অঙ্ক বুঝিয়ে বুঝিয়ে করেই দিচ্ছেন, রানি তাকিয়ে আছে, তার ভেতরটা ফাঁকা। নিচ্ছে না। কিচ্ছু থাকছে না, বসছে না। মাষ্টারমশাই চলে গেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে যেন।**

বিবাহোত্তর জীবনে মহারাণী সুনীতিদেবী পেয়েছেন নাম, যশ, প্রভাব প্রতিপত্তি সব। পেয়েছেন চার ছেলে তিন মেয়ে। সুনীতিদেবীর প্রজ্ঞার হাতছানি, তার রেশ এতই শ্রদ্ধার ছিল রাজীব মিত্র ও পরিবারের কাছে যে সম্রাজ্ঞীকে বাইরে পাঠিয়ে দিতে এক মিনিটও দ্বিধা করেন নি তিনি। সম্রাজ্ঞী মরমে মরে ছিল বেশ কিছুদিন। নতুন বন্ধুদের একটু অন্যরকম চাল চলন, নিয়মনিষ্ঠা শিখে নিতে, রপ্ত করতে করতে ছোটবেলার প্রিয় বন্ধুদের মুখ বুকের ভিতর ঘোরাফেরা করেছে। সোহাগিনী প্রায় সময়ই রাজনগর ছেড়ে কলকাতার বাসিন্দা হয়েছে রানির জন্যে। সে যে নতুন করে তৈরি হচ্ছে, নতুন তার বাতাবরণ। শিরে সংক্রান্তি পরীক্ষা। স্কুলেই তৈরি হয়ে যায় সবটুকু। অমনযোগের প্রশ্ন ওঠে না। যে যন্ত্রণা সে পেয়েছে সে তো সব হারানোর যন্ত্রণা। লাল ইট, দিঘির শহর, খোলা উঠোন ফেলে আসার যন্ত্রণা।

সোহাগিনীর জন্ম নবদ্বীপে। সে ভিটেভূমিতে এখন আর কেউ নেই। কিন্তু কন্যাকে না দেখলে মন ভরে না যে! স্কুল ছুটি থাকলে ছাত্রী আবাসন থেকে কন্যাকে নিজের উত্তর কলকাতার ভাড়া বাড়িতে নিয়ে আসে সোহাগিনী। ঠিক ওইরকমই কয়েকদিন রানি এলে ওকে নিয়ে চেপে বসেছে বাসে। দেখিয়ে এনেছে নবদ্বীপে নিজেদের সেই শরিকি বাড়ির উজ্জ্বল মন্দির, রাধা গোবিন্দ সেখানে এখনও আছেন। সে যেমনই হোক, সোহাগিনীর অতীত লাফ দিয়ে নেমেছে সামনের খোলা মাঠে। উচ্ছ্বসিত বালিকার মত মেয়ের সঙ্গে নেমে গেছে বাড়ির দীর্ঘ গভীর পুকুরে। সেখানে সাঁতরে এপার ওপার হয়ে দেখিয়ে দিয়েছে রানিকে, কেমন সাঁতার জানি দেখেছিস? অবাক চোখে রানি মা'র এই সাহসী এক অন্য রূপের অন্দরে ঢুকে গর্বিত হয়েছে। নিজে নামে নি সাহস করে। রাজীবের নিষেধ, তোর্সার জলে নামতে না দেওয়া আর সাবধানবাণীগুলো ঘুরপাক খেয়েছে এদিক ওদিক। ফলত সাঁতার শেখা আর হয়ে ওঠে নি। সোহাগিনীর তীব্র ইচ্ছেতেও।

আত্মীয় পরিজন এমনকি সোহাগিনীও রাজীব মিত্রকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। একবার যখন কলকাতায় ভর্তি করিয়ে দিয়েছ, ওখানেই রেখে দাও। তুমি বদলি নিয়ে নাও। হয়ত সে হতে পারত অন্য ইতিহাস লেখা। রাজীবের অনন্ত গুণগুলো যেন মহানগরীর ছোঁয়ায় আকাশ ধরতে পারত, হয়তো বাচিক শিল্পী সোহাগিনীর নাম নবদ্বীপ ছেড়ে এসে উঠত কলকাতায়। রবীন্দ্রসদন ছাড়িয়ে শিশির মঞ্চে। আসলে হয় না, হিসেব করে কিছু হয় নি কোনওদিন। স্বপ্ন ছবি আর বাস্তব মাটি অন্য কথা বলে।

মহানগরী ভালো লাগত না রানির। সব চিঠিতে সে কারুণ্য ছুঁয়ে দিত রাজীবকে। সে কেউ জানুক বা না জানুক রানি জানে। পিতা পুত্রীর গোপন আঁতাত সে বড় দুর্লভ। সে হোক, বাড়িতে সবাই জানে, রাজীবের সিদ্ধান্ত শেষ কথা।

যে কলেজ সামান্য একদিনের আন্দোলন আর ধর্মঘটের কারণে রাজীবকে রাজনগর ছাড়া করেছে, সে কলেজের ঐতিহাসিক চত্বরে সম্রাজ্ঞী এবার সত্যিই সম্রাজ্ঞী। ওর রেজাল্টে ডিপার্টমেন্ট, পরিবার বিশেষ করে বাবা মা আত্মসম্মান ফিরে পেয়ে মাথা তুলেছেন। আজ সকালে আনন্দের মাত্রাতিরিক্ত প্রকাশের মধ্যেও ফাঁক ফোকরে শূন্যতা খুঁজেছে রানি। আকাশের দিকে তাকিয়ে সে চিলের সন্ধান করেছে যে এক সময়ের আততায়ী। রানি জানে পিছন ঘুরতে নেই। ভাবতে নেই, যা গেছে তা গেছে, সামনে সময় অন্য কথা বলতে প্রস্তুত। ঠিক সেভাবেই দৌড় করিয়ে নিচ্ছে সময়।

১৩

সুনীতিদেবীর স্বপ্নের রাজনগরে তাঁর কথকতা, উপাসনা, উপস্থিতি সবার মনের মধ্যে কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল রানি এখন শুধু শুনে নয়, অক্ষরের আনাচ কানাচে ঢুকে জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজেছে। কত না সমাজ সংস্কারমূলক কাজ, আবার পিতার মানসিকতায় বেড়ে ওঠা সেই নারী অভিনয় প্রিয়ও ছিলেন। ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে কী সুন্দর সব অভিনয়ের ব্যবস্থা করতেন, ট্যাবলোর ব্যাবস্থা করেছিলেন। তিনি নিজে কল্পতরু বা আনন্দমেলার আয়োজন করেছিলেন শহরে, সে সময়ের ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলে রানি বন্ধুদের সঙ্গে সেই স্বপ্ন মেলায় ঘুরে এসেছে যেন কতবার! কেশবচন্দ্র সেনের জন্মদিন উপলক্ষে ১৯শে নভেম্বর 'কল্পতরু' হত। আলোয় সেজে উঠত শহর। ছোটদের খেলনা দিতেন মহারাণী। প্রার্থনা গান আর সংকীর্তন সহ নগরীর সমাগত অতিথিদের 'ব্রহ্মানন্দ ভোজ' করানো হত। কতজন গরীব মানুষ পাত পেড়ে সে সময় ভাত, ডাল, তরকারি, দৈ, মিষ্টি খেয়েছেন!

বইয়ের পৃষ্ঠায় এসব ছবিগুলো কখন সত্যি হয়ে যেত রানির পরিবারে। আদ্যন্ত বৈষ্ণব পরিবারে লাল মেঝের ঝকঝকে ঠাকুরঘরে চলত রাধা মাধবের নিত্য পুজো। ছোটবেলা থেকেই রানি দেখেছে, সরস্বতী পুজোর পর পর কিংবা শিব চতুর্দশীর সময় পক্ষকাল জুড়ে বৈষ্ণব মহোৎসব। কীর্তন অষ্টপ্রহর। অনেকেই শহরের বাজার এলাকায় জড় হত। বহু দূর দূর থেকে কীর্তনদল এসে একেবারে গৌরচন্দ্রিকা থেকে কৃষ্ণ জন্ম, তার বাল্যলীলা, কালীয় দমন, অভিসার, পূর্বরাগ অনুরাগের পদ গেয়ে একেবারে মাথু পর্যায়ে গিয়ে বিরহের পদ গাইত। সেই ছোট্ট রানি বন্ধুদের সঙ্গে একটু বেরোনোর ফাঁক পেলে সামনে নতুন বাজার এলাকায় নৌকা বিলাস পালা দেখত খুব মন দিয়ে। সেখানে কৃষ্ণ রাধা সখিদল সেজে কী অপূর্ব অভিনয় যে হত, এখনও সম্রাজ্ঞী মহারাণীর সে কল্পতরু অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। আর নিজেদের বাড়ির উঠোনে ম্যারাপ বেঁধে দিন থেকে রাত... অষ্টপ্রহর কীর্তন... টুকরো ছবি আর সমস্ত পাড়া জুড়ে সব মানুষের কলা পাতায় খাওয়া, একি ভোলা যায়! আর সে মাটির মেঝের বড় তরফের ঘরের মেঝে পোয়াল বিছিয়ে তার উপর চটের আচ্ছাদনে কীর্তন গায়ক, শ্রোতার বসার জায়গা করা হয়েছে। কৃষ্ণরাধার বড় ছবি, গৌরাঙ্গ নিতাইয়ের বাঁধানো ছবিতে চন্দন চর্চিত। আর বাটা চন্দন বাটিতে করে কোন বড় দিদি ধরিয়ে দিয়েছে রানির হাতে। তার হাতে এবার দু-চারটে গাঁদা ফুল, সে ফুল চন্দনে ডুবিয়ে সকলের কপালে ফোঁটা আঁকত সে ঘুরে ঘুরে ভিড় ঠেলে। আর কোনও কোনও কীর্তনীয়া সে চন্দনের ফেঁটা তাঁদের শ্রীখোলে লাগিয়ে নিত। আর যাঁরা করতাল বাজাতেন তাঁরা দুই করতালের মাঝখানে

চন্দনের ছোপ ভরে নিতেন। আর কী ভক্তি! জয় রাধে... জয় রাধে... গোবিন্দ বোল... সুরের সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ দিয়ে অবিরত ঝরে পড়ত জল। সেই তো রানির বেড়ে ওঠা মানুষ আর তার বিচিত্রতার সংসার। মাঝ বরাবর হংসিনীর মত হেঁটে যাওয়া মাথা তোলা।

মহারাণী সে সময় যে উপাসনার ব্যবস্থা করতেন, সেখানেও গৈরিক, আসন, একতারা, খোল করতাল, পতাকা, ধূপ, ধুনুচি, ধূপদান কী না থাকত! আর কর্মশিক্ষা, মেয়েদের স্বাবলম্বী করতে নানারকম জিনিস বানানোর শিক্ষা দেওয়া হত। সে সব শিশু বালক বালিকা মেয়েরাও কিনত। জিনিষ বানিয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হত। সে সময়ের এক পত্রিকা হাতে সংবাদ বিজ্ঞাপনের মত পাঠ করে সম্রাজ্ঞী অবাক। বন্ধুদের দেখিয়ে ১৯১৯ সালের এক খবর, শনিবার রবিবার ও সোমবারে কোচবিহারস্থ ল্যান্সডাউন হলে বাৎসরিক আনন্দবাজার হইবে। ৬ই ও ৮ই বৈশাখ শুধু মহিলাদের জন্য এবং ৭ই বৈশাখ সর্বসাধারণের জন্য হইবে। মধ্যাহ্নে ১২টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকিবে। পূর্ণবয়স্কদিগের প্রবেশ মূল্য এক আনা (সে সময় ছ পয়সা) ও বালক বালিকাদিগের দুই পয়সা (সে সময় তিন পয়সা)। এখন তো তিন পয়সাও নেই, ছ'পয়সাও না। কোচবিহারবাসী যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে নিম্ন ঠিকানায় দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থে প্রেরণ করতে পারিবেন।'

এই উন্নত উদার ভাবনা বিশেষত মহিলারা যারা হাতে কলমে জিনিস তৈরি করে আনন্দবাজার মেলায় পাঠাচ্ছেন, প্রত্যেকের নাম ঠিকানা লিখে দিতে হত। কারণ বিক্রি হলে সে মূল্য তাদের দেওয়া হত আর অবিক্রিত জিনিস তারা ফেরৎ পেতেন পরবর্তী আনন্দমেলার জন্য। ...অবাক ওরা, এখন কত মেলা... মেলার সম্ভার। কত নারীর জীবন জীবিকা চলছে নিজেদের চেষ্টায়। আর সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের আলোর দিশা মহারাণী সুনীতিদেবী এ প্রান্ত রাজ্য কোচবিহারে থেকে রাজমাতা হিসেবে রাজ্য পরিচালনও করেছিলেন।

* * *

কলেজ পর্ব শেষ হল কি হল না সোহাগিনীর মৃদু খুতখুতুনি শুরু। রাজীবও এ উৎপাতে বিরক্ত। কী না রানিকে আমাদের সম্রাজ্ঞীকে এখনই পাত্রস্থ করা চাই। খোঁজ লাগাও। ইত্যাদি। সম্রাজ্ঞীর বুকের সূক্ষ কাঁটার নড়াচড়া। কলেজের মার্কশিট এখনও হাতে আসে নি। এমএ ক্লাসে ভর্তির তোড়জোড় চলছে। সেই আবার দূরে থেকে নতুন করে হোস্টেল জীবন। এখনতো সেই মানুষ হয়ে ফিরে আসার সময়। সোহাগিনী এমন করছে কেন উঠতে বসতে। মন খারাপ করে বসে বসে আকাশ দেখে। তোর্সার ধারের বড় বড় বোল্ডার আর একটু দূরে চলে যাওয়া নদী স্রোত চোখে ভাসে। রাজীব সবটা বোঝেন। চোখ মটকে ফিস ফিস করে মেয়ের কানে কানে বলে, বলুক মা, প্রতিবাদের দরকার নেই। ইউনিভার্সিটির দায়িত্ব আমার। তোকে তো পড়তেই হবে। লক্ষ্য রাখিস অনেক উঁচুতে। শীর্ষবিন্দুতে চোখ রাখলে দু এক ধাপ নামলে ক্ষতি নেই, কিন্তু চোখ উঁচুতেই রাখতে হবে। উদ্দীপনা, উৎসাহে টইটম্বুর সম্রাজ্ঞী। সোহাগিনী বললেও এখন শুধু হেসে মাথা নেড়ে যাওয়া। বাবার শিখিয়ে দেওয়া— অশান্তি করা চলবে না। তখুনি ভেবে নেয় ১৮৮৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলির বছরে মহারানী সুনীতি দেবী মহারাজার সঙ্গে ইংল্যান্ড পর্যন্ত গিয়েছিলেন। এই বিলেত যাওয়াও সে সময়ে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। আর আমাদের রানি রাজনগর পেরোনো মহানগরীতে একা থাকতে পারবে না! নিশ্চয়ই পারবে। মনের ভিতর অদম্য সংকল্প। আশ্চর্য, নিরুচ্চার প্রত্যয়।

**কলেজ পর্ব শেষ হল কি হল না সোহাগিনীর মৃদু খুতখুতুনি শুরু। রাজীবও এ উৎপাতে বিরক্ত। কী না রানিকে আমাদের সম্রাজ্ঞীকে এখনই পাত্রস্থ করা চাই। খোঁজ লাগাও। ইত্যাদি। সম্রাজ্ঞীর বুকের সূক্ষ কাঁটার নড়াচড়া। কলেজের মার্কশিট এখনও হাতে আসে নি। এমএ ক্লাসে ভর্তির তোড়জোড় চলছে। সেই আবার দূরে থেকে নতুন করে হোস্টেল জীবন। এখনতো সেই মানুষ হয়ে ফিরে আসার সময়। সোহাগিনী এমন করছে কেন উঠতে বসতে!**

* * *

রাজীবের ক্লাবে ছোট্ট সম্রাজ্ঞীর সাবলীল অভিনয় গুণ এখনও রাজীবের বন্ধুরা উচ্চারণ করে। এখনও তো ইচ্ছেগুলো মরে যায় নি। স্কুলের সেই বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণীর কথা মনে পড়ে রানির। অনেক আগে ল্যান্সডাউন হলে কিংবা মহারাণীর উপস্থিতিতে কয়েকবারের পুরস্কার বিতরণীর কথা সম্রাজ্ঞী আর বন্ধুরা পুরনো পত্রিকায় খুঁজে পেয়েছে। কখনও কখনও ছাত্রীদের রাজপ্রাসাদে ডেকেও ছোট ছোট মূল্যাবান উপহারে পুরস্কৃত ও উৎসাহিত করতেন। ...রানি পত্রিকায় অনেক আগের প্রাক্তনীদের কলম পড়ে নিচ্ছিল। কুঞ্জবালা চৌধুরী লিখছেন, 'পড়াশুনার পর মিশনারী মহিলারা আমাদের যিশুখ্রিষ্টের গান শেখাতেন, বাইবেল পড়াতেন। সবই পড়তাম বাংলায়। তবে ইংরাজি ফার্স্টবুক আমাদের পড়তে হত, সেটাই একমাত্র ইংরাজি তখন। প্রতিবছর বৈশাখ মাসে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ, মহারানী সুনীতি দেবী এসে আমাদের প্রাইজ দিতেন। ছাত্রবৃত্তি পাশ করলে তাকে শাড়ি প্রাইজ দেওয়া হত।' আর হিরণবালা দেবীর স্মৃতিকথায় তো মহারাণীর নিজের হাতে দেওয়া শংসাপত্রের প্রতিলিপিও ছাপিয়ে দেওয়া আছে। এখনকার নিরিখে সম্রাজ্ঞীরা ভাবতে গেলে অবাক হয়, তখন নয় দশ বছরের বালিকারা শাড়ি পরে কী অদ্ভুত হাতে কলমে শিক্ষা নিচ্ছে, মেমদের কাছে কত কীই যে শিখেছে। হিরণবালা দেবী লিখছেন, 'মহারানী সুনীতি দেবী আমাদের খুব ভাল বাসতেন। তিনি মাঝে মাঝে স্কুলে এসে আমাদের পড়াশোনা কী রকম হচ্ছে তা দেখতেন। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়ে ফল ও মিষ্টি দিতেন।'এসব কথাগুলোয় রানির শুধু ঠাকুমার মুখখানা মনে পড়ে। সেই ফিটন গাড়ি চেপে স্কুলে যাওয়া আসার গল্প ছবি চোখ ঝাপসা করে।

একজন প্রতিভাময়ীর প্রভাব যে শহরে যে বিদ্যালয়ে পড়েছে, নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে সে শহর যে এগিয়ে থাকবেই একথা সম্রাজ্ঞীর মহানগরীর বন্ধুরাও জানে। মহারাণী যে স্ত্রী শিক্ষায় কতটা অগ্রণী ১৮৯০-৯১ সালের এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্টে সেদিন দেখেছিল ওরা কলেজ লাইব্রেরিতে। তখন ওই স্মৃতিচারণের নারীদের লেখা শব্দগুলো মনে পড়ছিল রানির।

'Her Highness the Maharanee was pleased to invite the girls of the Sunity College to the Palace in may last–and after delivering to them an interesting address on their duties as girls–wives and mothers–gave them prizes of useful books-nice cloths-plates-boxes and other fancy things. The Maharaja also was kind enough to be present on the occasion and to award a silver medal to the first girl and some appropriate prizes to others.'

সেই ট্রাডিশন সেই রাজকীয় প্রথায় আভিজাত্য নিয়ে দিনের পর দিন ঘটেই চলেছে। বদলেছে মানুষ, ধরন, রীতি, কিছু ভাল, কিছু মন্দ মিশেলে মানুষের মিছিল চলছেই। রানির হাতে ধরা এ মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের বলাকা আর পুনশ্চ দুটোতেই সুনীতি একাডেমির পুরস্কারের প্রতীক চিহ্নটির ছবি লাগানো। মাঝ বরাবর প্রদীপ। গোল করে তাকে ঘিরে অসতোমা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়...আহা! বিশ্বভারতীর একটু হলদেটে মলাটের আভিজাত্যে আর লাল কালির আখরে হাত বুলিয় দেয় সে। আর চোখের সামনে সে সংস্কৃত নাটক, ইংরেজি অথবা বাংলা নাটকের ধারাভাষ্যরা উঠে আসে। নাটক করে কম পুরস্কার তো জোটেনি! আহা, এবার রেজাল্ট হাতে পাওয়া আর এমএ ক্লাসে ভর্তি হয়ে হোস্টেল চলে যাওয়ার ফাঁকটুকুতে অভিনয় অভিনয় করছে মন। আর অভিনয়ের কথা উঠলেই রাজীবের পাশে আর এক মুখ উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে। আবার ঝাঁপিয়ে আসে বছর দুয়েক আগের সে মুখ। যাকে দূরেই রেখেছে এতদিন। আর কী আশ্চর্য! রাস্তা ঘাটে চরকি পাকে অথবা কলেজ চত্বরেও আর কখনও অরুণের মুখ দেখেনি রানি। আজ বৈঠকখানায় বন্ধু বান্ধবীর ভিড়ে পুরনো প্রসঙ্গ উঠে পড়ে কথায় কথায়। প্রজ্ঞা হঠাৎ বলে, আরে! নাটক শুরু করতে গেলে অরুণদার নম্বরটা যোগাড় করতে হবে। ...বুক কেমন করে কেন যে! সম্রাজ্ঞী জানে না। শুভ রানির চুপ করে যাওয়া লক্ষ্য করেই বোধহয় অরুণের ফোন নম্বর বের করতে গিয়েও ঢুকিয়ে রাখে। ল্যান্ডলাইনের ভরসা আর করছে না মানুষ। রানিদের ল্যান্ডলাইন সদ্য ঢুকেছে। এখনো সে মৌতাতেই থাকে ও। আর যখন ফোন ছিল না, তখন! চিঠি চিঠি আর প্রতীক্ষা। একটু খবরের প্রত্যাশা। পরদিন খবরের কাগজের ভোর। সে কি খারাপ ছিল! রাজীব সেসব দিনের গল্প শুনিয়েছে রানিকে। আর সম্রাজ্ঞী তার বন্ধুদের রিলে করে সে সব। ওরা হৈ হৈ করে ঠিক করে ফেলে, না রে, এবার একেবারে আধুনিক ড্রামা হবে। খানিকটা থার্ড ফর্ম। প্রসেনিয়াম, দর্শক, কুশীলব একাকার। দ্যাখ, এ স্ক্রিপ্টটা, শুভ বের করে পড়তে শুরু করে। নাটকের নামটা একটু উল্টে দেখে নেয় সম্রাজ্ঞী। 'দেবতার জন্ম'। নাট্যকার শিবাশিস ভাদুড়ী। বেশ নাম করেছেন নাট্যকার। আলো, নির্দেশনা মঞ্চসজ্জা সব একটু অন্যরকম। এতেই নাটক চনমনে হয়ে যাবে। চাই রিহার্সাল। আর দ্রুত সারতে হবে কাস্টিং। সময় তো এগিয়ে আসছে। সম্রাজ্ঞীকেও যে রাজনগর ছাড়তে হবে।

১৪

বেশ ক'টা পত্রিকা রাখে রাজীব। ওদের তোর্সার দূরে চলে যাওয়া বাঁধ লাগোয়া বাড়িটার টানা বারান্দায় ভোর ভোর মূল খবর কাগজদুটো এসে পড়ে। আনন্দবাজার তো আছেই। যুগান্তর, বসুমতী, আর স্থানীয় রাজনগর সমাচার। হাতে করে নিয়ে

আসেন সম্পাদক নিজেই। অমিয় দত্ত। সম্রাজ্ঞীর সকাল ভ'রে থাকে, রোদের উঠোন। রাজীবের উঠোনে বসে অমিয় দত্তের সঙ্গে মেলা বক বক, কাগজ সম্পর্কিত পরিকল্পনা, আর খানিক প্রুফ সংশোধন। আজও মা'র বানিয়ে দেওয়া দু কাপ চা রান্নাঘর থেকে এনে অমিয় জেঠুর হাতে দেয়। বাবারটা পাশের বেতের টেবিলে রাখে। ধোঁয়া ওঠা চায়ে চুমুক দিয়েই রাজীবের খুশির চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়ায় রানি। ...ওরে, ...দেখ দেখ, যুগান্তরের সাময়িকীটায় তোর সেই গল্পটা বেরিয়েছে রানি। 'অলকেশের বাড়ীঘর' ...ভীষণ খুশি হয়ে যায় রানি। বাবার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে। কী সুন্দর ইলাস্ট্রেশন। মনে আছে ছোটবেলায় ওই যুগান্তরেই প্রথম আঁকা ছবি বেরিয়েছিল তার। আর ১০ টাকা পেয়েছিল। সে তো কবেকার কথা! রাজীব যে স্বপ্নগুলো একটু একটু করে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে এটা বুঝতে পেরে আজ অমিয় জেঠুও পিঠ চাপড়ে দেয় রানির। মাথায় রাখেন স্নেহের হাত। সম্রাজ্ঞী মিত্রের নাম ঝকঝক করছে গল্পের নামের পাশে। রাজীবকে তো জানায় ইনি আরও দু-চারটে গল্প কবিতা বাইরেও পাঠিয়ে দিয়েছে। ঠিকানা দেখে দেখে। আসলে কল্পনার আকাশ তো বেজায় বড়। তাকে মাটিতে টেনে আনতে ইচ্ছে করে যে! এবার অমিয় দত্ত মোক্ষম কথাখানা বলে বুকের ইচ্ছেটা আকাশ প্রমাণ করে দেন। ...আরে আমাদের দেশে হবে... সেই মেয়ে কবে? ছেলে বলবে, কেন রে রাজীব! ওই মেয়েই পারবে দেখিস। আমাদের মহারাণী সুনীতিদেবীর সাহিত্য প্রতিভার খবর কে না জানে বল! আমার তো ভাবতে অবাক লাগে সারাজীবনে এগারো খানা বাংলা গ্রন্থ রচনা করেছেন, ব্রজেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত ও লিখিত সাহিত্য সাধক চরিত মালা এবং 'বঙ্গ সাহিত্যে নারী'র মত অতি জনপ্রিয় গ্রন্থ রচনা করেও বঙ্গ সাহিত্যে সেভাবে তাঁর স্থান নেই কেন... ভেবে দেখতো রাজীব... সে কি এই প্রান্তিক নগরীর মহারাণী বলে! শুধু বঙ্গের মহিলা কবি বলে সামান্য প্রশংসা কি তাঁর প্রাপ্য! আসলে ওই মহিলা, নারী তকমাগুলো সাহিত্যে আনাই উচিত নয়।

রাজীব এবার বন্ধুকে পুরনো এক সুভেনিরের পৃষ্ঠা খুলে দেখায়। বন্ধু, করছ তো 'রাজনগর সমাচার', একেবারে খাঁটি কথা বলেছ এতদিনে। ওই প্রান্তিক তকমা, উত্তর গন্ধী বিশেষণগুলো উঠিয়ে দাওতো বাপু... দেখ, মহারাণীর বইয়ের তালিকা দেখ...

অমৃতবিন্দু ১ম খন্ড, প্রকাশ ১৩২৫— সংগীত বিষয়ক। অমৃতবিন্দু ২য় খন্ড, ১৩৩২। কথকতার গান, ১৩২৮। ঝড়ের দোলা, ১৯২১, এটা চারটি গল্প সংকলন। সাহানা, ১৯১৫, বিবিধ কবিতা। শিশু কেশব, ১৯২২, কেশব চন্দ্রের বাল্যকাল। শিবনাথ ১৯২১ শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন চরিত। সংঘশঙ্খ, সতী, গীতিনাট্যয়... এই বাংলা গ্রন্থের সমাহারই শুধু নয় রে রানি, দেখ, এবার ইংরেজি তালিকায় চোখ রাখ। The Rajput Princesses–The beautiful Mogul princesses1918, The life of princess Yashodara, The Bengaal Dacoits and tigers, The autobiography of an Indian Princess1921, Indian Fairy Tales, 1922, prayers.

রানির মুগ্ধ চোখ অমিয় দত্তের চোখ এড়ায় না। দেখ মা, বাংলা সাহিত্যে সেভাবে তাঁর নাম উচ্চ মর্যাদায় উচ্চারণ না করলে কী হবে? ইতিহাস তো বদলে যাবে না! ১৮৮৮ সালে 'সুবর্ণ জয়ন্তী' উৎসব উপলক্ষে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁকে সি-আই-ই (ক্রাউন অব ইন্ডিয়ান এম্পায়ার) উপাধিতে ভূষিত করেন। এ খেতাব ভারতীয় নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম। মহারাণী ভিক্টোরিয়া সুনীতি দেবীর রূপ ও গুণ দুয়েই মুগ্ধ হয়েছিলেন নিজেই তা বলে গেছেন। আর কী জানিস? তিনি সুনীতিদেবীর এক পুত্র নিত্যেন্দ্রনারায়ণের ধর্মমাতা হিসেবে স্বীকৃত হন।

...ও-ও জেঠু, এই জন্যই নিত্যেন্দ্রনারায়ণ ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ?

...হুম, ঠিক বলেছিস।

সুনীতি দেবী মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে তো লন্ডনে গিয়েছিলেন, আবার মহারাজার মৃত্যুর পরও অনেকবার লন্ডনে গেছেন।

রাজীব মিত্র যেন স্বপ্নে আছেন। রানিকে নিয়ে স্বপ্নে বাস আজকের নয়। নামকরণ নিয়ে সম্রাজ্ঞীর ইচ্ছে রানি নিজেও টের পায়। ভাবতে ভালোবাসে। রাজীব খুব ধীরে বলেন, জানিস রানি, সব কাজের মধ্যেই নিষ্ঠা চাই। সময় নেই সময় নেই কারা বলে জানিস! ফাঁকি দেওয়া স্বভাব যাদের। তুই একথা কখনও বলবি না। সুনীতিদেবীর সমস্ত জীবনই কী ভীষণ নিষ্ঠা আর কর্মযোগীর মত, বিভিন্ন ধারার কাজে উনিও তো ঠাকুরবাড়ির মানুষগুলোর মতই এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করার মত নাম। এই কারণেই মৃত্যুর পরও প্রবাসে তাঁর খ্যাতি অটুট ছিল, আজও আছে।

রানির চোখে আনন্দের ফুলকি ছোটে। এ কি উদ্দীপনার আলো! কাগজটা হাতে নিয়েই কথার মাঝখানেই দৌড়ে যায় ভিতরে সোহাগিনীকে দেখাবে বলে।

অমিয় দত্ত রাজীবকে রানির কলমের প্রশংসা করে বলেন, প্রথম প্রকাশ হল, আর তোর মেয়ে বলে বলছি না, লেখায় নিজস্ব ঘরানা আছে কিন্তু।

*(ক্রমশ)*

## শিলিগুড়ি ডায়েরি

# কোন পথে যে চলি!

এই তো আজ সন্ধেবেলায় ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে কিছু সংলাপ শুনছিলাম। শহর শিলিগুড়ি জুড়ে ওয়ার্ড উৎসব চলছে। আমাদের বাড়ির পাশেই একটা মাঠ, সেখানেই উৎসব চলছে আর সেখান থেকেই ভেসে আসছে সংলাপ, নাটকের। মহিলা পরিচালিত, মহিলা অভিনীত নাটক মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে আর দর্শকের ভিড় হবে না! ভিড় তো হয়েছেই ততধিক ভিড় হয়েছে মোটর বাইকের। দু-চাকার এই যান সারিবদ্ধ রাস্তার দু"ধারে, মানুষ বাইরে থেকে এসে নিজের ঘরে ঢুকতে পারছে না। গেটের মুখ আটকে দাঁড় করানো বাইক। স্বভাবতই বাড়ির মালিক ও গাড়ির মালিক মুখোমুখি। চিৎকার চেঁচামেচি প্রায় হাতাহাতির পর্যায়ে।

এই হল পার্কিংএর স্টেটাস, হ্যাঁ ক্রমশ উন্নতির পথে আরও এগিয়ে চলা শিলিগুড়ির কথাই আমি বলছি। শুধু কি মোটরবাইক তাদের সঙ্গ দিতে অটো, টোটো, রিক্সা কে নেই! হাকিমপাড়া মেন রোড বা ঋষি অরবিন্দ রোডের দুই পাশে দাঁড় করানো থাকে দু-চাকার যানগুলি। কী তাদের কেতা! মাঝে মাঝে বুঝে উঠতে পারি না সেন্ট্রালব্যাঙ্কের ওই শাখার প্রবেশপথ কোনটা? রীতিমত লড়াই করতে করতে পৌঁছতে হয় লক্ষ্যে। শারীরিক ক্ষমতা ঠিকঠাক না থাকলে খুব সমস্যা হয়। এখানে

একটি নিয়ম চলে তাই পার্কিংএর বিরুদ্ধে মুখ বন্ধ রাখতেই হয়। রাস্তার দু'পাশে সাদা লাইন টানা ,ওর মধ্যেই পার্কিংএর ব্যবস্থা। নিয়ম বলে কথা! তবে অনেকেই এসব মানেন না। এরপর রয়েছে অটো ও টোটো। বিধান রোডের রাস্তা জুড়ে তাদের অপেক্ষা চলে সওয়ারি তোলার জন্য। কিছু বলার নেই। সবাইকেই তো করে খেতে হবে। তারাই বা দাঁড় করাবেন কোথায় তাদের জীবিকা-যানগুলিকে। গোষ্ঠপালের মূর্তির সামনে রিকশাওয়ালারা সেটিং করে রেখেছেন, এরকমই তাদের বক্তব্য।

তারপর তো রাস্তাজুড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন ঠেলাওয়ালারা ফল বারোভাজা কেক-বিস্কুট জড়িবুটি গেরস্থালির জিনিসপত্র - বাপরে কী নেই সেইসব ঠেলায়। আমরাও তো বেশ কেনাকাটা করি দরদাম করে আবার যানজটের ঠেলায় বিরক্তও হই। মনকে বোঝাই কেউ তো আর চুরি করছে না, করে খাচ্ছে সবাই। রাস্তাচুরি আবার চুরি না কি! রয়েছে দোকানের জিনিস বাইরে সাজিয়ে রাখার প্রবণতা। যেন রাস্তা থেকেই ক্রেতা তার প্রয়োজনীয় জিনিসটি পেয়ে যায়। তাছাড়া দোকানে অত জায়গাই বা কোথায়! সুতরাং রাস্তা এখন হকার গাড়ি বাইক রিকশা ভ্যান ঠেলা সকলের দখলে। যে যেখানে খুশি গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। কেউ দেখার নেই। কর্পোরেশন পুলিশ সকলেই মুখে আঙুল দিয়ে থাকেন। একে তো ভোট-ভগবানের কোপে পড়ার ব্যাপার আছে তারপর এটাকে ইস্যু করে বন্ধ আন্দোলনের আশঙ্কাকেও তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুতরাং মুখে কুলুপ আঁটাই ভাল। আর আমরা, যাদের দু'চাকা চারচাকা আছে অথবা নেই, যারা নিজেরাও যত্রতত্র দাঁড় করিয়ে দেই বাহনটিকে আর নেই-ওয়ালাদের গালাগালি শুনি সকলেই মুখ বুঁজে মেনে নিয়েছি পার্কিং সমস্যা।

শহরের লোকসংখ্যা ও যান সংখ্যা সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে; শুধু সেই হারে একটু ঠিকঠাক প্ল্যান করে এবং প্রশাসনিক ভাবে একটু কঠোর হলে সম্ভবত এই লেখাটি অযৌক্তিক অপ্রাসঙ্গিক হত... সেই আশায় বরং বাঁচি।

**শ্যামলী সেনগুপ্ত**

ধারাবাহিক কাহিনি

অরণ্য মিত্র

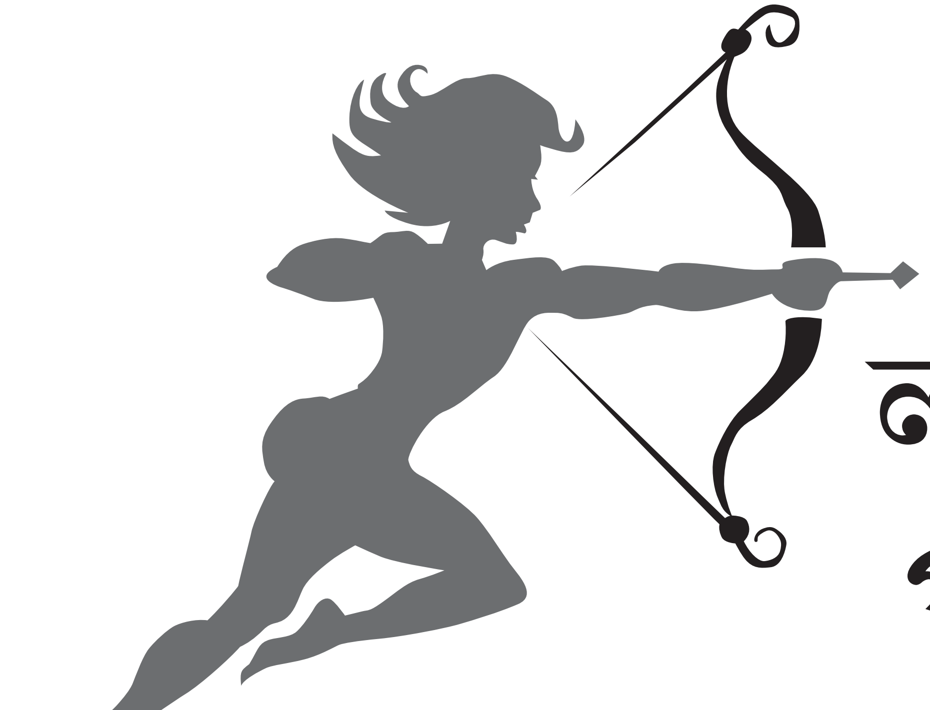

# লক্ষ্যভ্রষ্ট পঞ্চশর

**তাহলে কি রবি হত্যার কোনও কিনারা হবে না? ময়নাগুড়ির এস আই নন্দন বর্মার বাড়িতে চা খেতে এসে জানিয়ে গেলেন গোটা ব্যাপারটাই অথৈ জলে। রাধু বর্মনের পরিবারকে সন্দেহ করাই যায়, কিন্তু মোটিভ কোথায়? এদিকে সন্দীপ জানার মনের অরণ্যে হঠাৎ রঙিন অর্কিড ফুটতে লাগল। নির্জন বনানী নামের ফেসবুক বন্ধুর পরিচয় পাওয়া গেল। এই প্রথম রিয়ার ছবি একজন ফোটোগ্রাফারের মত তুলতে পারলেন তিনি। কিন্তু ফালাকাটার ভৃগু জ্যোতিষ কি কিছু চেপে যাচ্ছেন? এবার তাঁর মুখোমুখি হয়ে কী মনে হলো নন্দন বর্মার? একটি হত্যা রহস্যের আরও একটি পরৎ খুলে গেল এবার।**

২১

দোলের তিনদিন পর রাধু বর্মনের বাড়িতে সঙ্কোটমোচন যজ্ঞ আর পুজোয় নন্দন বর্মার নেমন্তন্ন ছিল। দোলের এখনও সাতদিন দেরি। কিন্তু গতকাল সন্ধে নাগাদ রাধু বর্মন নেমন্তন্নের কথাটা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য ফোন করেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে ভৃগু জ্যোতিষের কথা উঠেছিল। তাঁর বিষয়ে বন্ধুর কাছ থেকে কয়েকটি প্রশংসা বাক্য শোনার পর নন্দন বর্মার মাথায় ঘুমিয়ে পড়া পোকাটা একটু পাশ ফেরে। রবি রহস্য নিয়ে তিনি ইদানিং আর ভাবছিলেন না। জলপাইগুড়িতে পুষ্প প্রদর্শনি দেখতে গিয়ে তাঁর মাথায় অর্কিড ঢুকে পড়েছিল। সোজা কার্শিয়ং গিয়ে বেশ কিছু গাছের ছানা কিনে এনে সে সব নিয়ে মেতে আছেন। ফলে কাশিয়াগুড়িতে ঘন ঘনই আসছেন তিনি।

দিন চারেক হলো কাশিয়াগুড়ি থেকে ফিরেছেন। নন্দন বর্মা ভেবেছিলেন আবার যাবেন যজ্ঞের আগের দিন। অর্কিড বিষয়ক একটা বিখ্যাত বই আজকালের মধ্যেই চলে আসবে। কিন্তু ভৃগু জ্যোতিষের কথা জেনে কী জানি ভেবে ঠিক করলেন, ফালাকাটায় যাবেন। সেই ভেবে দোলের আগের দিন সকাল ন-টা নাগাদ ভৃগু জ্যোতিষের চেম্বারে নাম লিখিয়ে জানতে পারলেন একজন একটু আগে গেছেন, আরেকজন এসেছেন মেয়ের বিয়ের তারিখ বাছতে। শেষের কাজটায় একটু সময় লাগবে।

এ সব জেনে নন্দন বর্মা ভুর কুঁচকে একটু চিন্তা করার অভিনয় করে বললেন, ‘তবে আজ আর হবে না বোধহয়। আসলে জলপাইগুড়ি ফিরতে হবে তো!’

‘দাঁড়ান। স্যারকে একবার বলি।’

নন্দন বর্মা চারদিক দেখলেন। জ্যোতিষের পসার আছে। বসার ঘরে এসি লাগিয়ে রেখেছেন। টিভিও আছে। জ্যোতিষের সাফল্য নির্ভর করে তিনি ক্লায়েন্টকে মানুষ হিসেবে কতটা বুঝতে পারলেন, তার ওপর। একজন সফল জ্যোতিষি অনেক পরিবারের গোপন রহস্য জানেন। ভৃগু জ্যোতিষ নিশ্চই রিয়ার ব্যাপারে কিছু জানেন।

রবি ঘি আনতে গিয়ে এক ঘন্টা রাধু বর্মনের বাড়িতে ছিল। সেই এক ঘন্টায় কিছু একটা ঘটতেই হবে। তেমন কিছু ঘটলে সেটা গোপন রাখার মত বুদ্ধিমত্তা রিয়া ছাড়া আর কারও নেই।

কিন্তু রিয়া সেটা ভৃগু জ্যোতিষের কাছে লুকোবে? সম্ভবত না। বন্ধুর মুখে সে বাড়ির সঙ্গে ভৃগুবাবুর ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পেয়ে সেটাই মনে হচ্ছে নন্দন বর্মার।

ছেলেটা ফিরে এসে হেসে বলল, ‘পনের মিনিট জাস্ট। আগেও হতে পারে।’

‘থ্যাঙ্কিউ ভাই!’

বসার ঘরেই জ্যোতিষির একটা ছবি টাঙান। এ থ্রি সাইজের পোস্টার একটা। রক্তবস্ত্র পরিহিত ভৃগুবাবু দন্ডায়মান। হাতে ত্রিশূল। নিচে লেখা ‘দ্য ভৃগু’। নন্দন বর্মা ছবিটির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, ‘উনি কি তান্ত্রিক জ্যোতিষ?’

‘গোল্ড মেডেলিস্ট। এই ছবিটা বেনারসের এক ভক্ত ওনাকে গিফট করেছেন।’

মিনিট দশেক না গড়াতেই ডাক এল। তবে পেল্লায় টেবিলের ওপাড়ে থাকা ভৃগুবাবু গায়ে একটা চমৎকার শাল জড়িয়ে বসেছিলেন। রক্তবস্ত্র আর লম্বা সিঁদুরের টিপ ছাড়া তাঁকে বেশ হাসিখুশি মানুষ মনে হচ্ছিল। লম্বা, স্বাস্থ্যবান, কালো মানুষটির চোখজোড়া বেশ তীব্র।

‘আসুন।’

‘এই আপনার ফিজ।’ টেবিলের ওপর একটা খাম রেখে বললেন নন্দন বর্মা। ‘আমি ভাগ্য বিচার করতে আসি নি। আমার কিছু কৌতূহল আছে।’

‘কী ব্যাপারে?’

‘আপনার নাম আমি জেনেছি রাধু বর্মনের মুখে। সে আমার ক্লাস ফ্রেন্ড। আমার নাম নন্দন বর্মা।’

‘তাই বলুন!’ মোলায়েম হাসি খেলে গেল জ্যোতিষির মুখে। ‘নেক্সট উইকেই তো যাচ্ছি সেখানে যজ্ঞ করতে।’

‘রবি খুনের ব্যাপারে আপনি কী জানেন?’

তিন সেকেন্ড স্থির চোখে নন্দন বর্মার দিকে তাকিয়ে ভৃগুবাবু ঠান্ডা গলায় বললেন, ‘এই প্রশ্ন আপনি আমাকে করতে এসেছেন কেন বুঝতে পারছি না। তবে হ্যাঁ,

খুনটার কারণে যজ্ঞটা হচ্ছে। ব্যাপারটা অশুভ। দোষ কাটানোর জন্য এই সব।'

'খুনের রহস্য ভেদ না হলে রাধু শান্তি পাবে না। রবিকে শেষ তাঁর বাড়িতেই দেখা গেছে। আর, আমার ধারণা সে বাড়িতে কিছু একটা হয়েছিল যেটা হয় তো কেউ জানে।'

ভৃগু জ্যোতিষ কিছু বললেন না। চুপ করে ভেন্টিলেটরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

'রাধুর আত্মিয়, কী জানি নাম, বোধহয় গুবলি— তাঁর একটা জটিল সমস্যা আপনি সারিয়েছিলেন।' নন্দন বর্মা বলে চললেন। 'মেয়েটার মধ্যে একটা অ্যাবনর্মালিটি চলে এসেছিল। আপনি সারিয়ে দিয়েছিলেন।'

ভৃগু জ্যোতিষ এবার মৃদু হেসে বললেন, 'সবই মায়ের ইচ্ছে। আপনি যখন রাধুবাবুর বন্ধু, আপনি নিশ্চই ওদের ভালোই চাইবেন। আশা করি গোপন রাখবেন সব কিছু। তবে, পুরোটা আমি আপনাকে বলব না। খুনের ব্যাপারে কিছু জিগ্যেস করবেন না।'

'ওকে!' নন্দন বর্মা এক মুহূর্ত ভাবলেন। 'রিয়াকে আপনি কতদিন চেনেন?'

'মনোজের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ আমিই ঠিক করে দিয়েছিলাম। রাধুবাবু বলেছিলেন ছোট ছেলের জন্য লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমতী মেয়ে চাই। পণ নেবেন না। কাস্ট-ফাস্টের ব্যাপার নেই। রিয়ার অবশ্য আরও কিছু যোগাযোগ এসেছিল। পাত্রপক্ষের পছন্দও ছিল। কিন্তু সবক্ষেত্রেই পণ চাওয়া হচ্ছিল। রিয়া রাজি ছিল না। মনোজের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ম্যাচ করে যায়। বিয়ে ভালই হয়েছে।'

'রবিকে?'

'রবিকে আমি চিনতাম না।'

'সে কি রিয়াকে চিনত?'

ভৃগু জ্যোতিষ হাসলেন। 'রবির খোঁজ খবর করলে বুঝবেন মাথাভাঙ্গা ছেড়ে শালগুড়িতে রাধু বর্মনের মুদির দোকানের কাজ করতে আসার দরকার ছিল না তাঁর। ক-টাকাই পেত সেখানে?'

'ভেবেছি। কিন্তু একটার বেশি কারণ পাই নি।'

'শুনি সেটা।'

নন্দন বর্মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'মনে হয় সে রিয়াকে জানত। হয় তো এমন ভাবে জানত যাতে রিয়া তাঁকে দরকারে টাকা দিতে বাধ্য থাকে। সোজা ভাষায় যাকে বলে ব্ল্যাকমেল।'

ভৃগু জ্যোতিষ বিষণ্ণ হেসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'এর বেশি আর কিছু জিগ্যেস করবেন না। আমাদের পেশাগত দায়বদ্ধতা আছে।'

## ২২

সন্দীপ জানার জীবনে এখন ভরপুর বসন্ত। সেই বসন্তের হাওয়ায় রিয়া ঝাপসা। হাওয়ায় এখন কেবলই বনানী। রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কটা সহজ হয়ে যাওয়ার পর মনোজবাবুকেও খুব একটা পাত্তা দিচ্ছেন না সন্দীপ জানা। ঠাট্টা-ইয়ার্কিও চলছে। তবে বনানীর ব্যাপারটা গোপন রাখার চেষ্টা করছেন সন্দীপ জানা। শালগুড়িতে বনানীর সঙ্গে দেখা করার কোনও প্রশ্নই উঠছে না। একদিন ময়নাগুড়িতে গোপনে দেখা করে একটু ঘোরাঘুরি হয়েছিল, কিন্তু পরদিন সন্দীপ জানা আবিষ্কার করেন যে ঘোরাঘুরির সংবাদ সামান্য হলেও ছাত্রছাত্রী মহলে কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। সংবাদদাতাদের নেটওয়ার্ক বিবেচনা করে আর ঝুঁকি নেন নি সন্দীপ জানা।

কাল রিয়ার বাড়িতে যজ্ঞ। আজ থেকেই যজ্ঞিবাড়ির ফোটো তোলার কথা সন্দীপ জানার। বিকেল নাগাদ ভৃগু জ্যোতিষ এলেই ধুম পড়ে যাবে। তার আগেই তাঁর সেখানে পৌঁছে যাওয়া উচিত। পরশু দোল ছিল। এদিকে রঙ খেলা হয় দু-দিন। আজকেও যে খেলা পুরোপুরি বন্ধ হয়েছে, তেমন নয়। পরশু রিয়ার বাড়ি হোলি উপলক্ষে গিয়ে বনানীকে রঙ মাখিয়েছেন সন্দীপ জানা। রিয়াই ডেকে এনেছিল বনানীকে। এর প্রতিদানে যজ্ঞের দুর্দান্ত ফোটো না তুলে দিলে চলবে?

ক্যামেরা-লেন্স ইত্যাদি ব্যাগে ভরে সন্দীপ জানা সাড়ে তিনটে নাগাদ বের হলেন। ঠান্ডা চলে গেলেও গরম এখনো পড়ে নি। এই রকম আবহাওয়ায় বনানীকে নিয়ে পাহাড়ে চলে গেলে বেশ হত। যাওয়া যে অসম্ভব, তা নয়। ভাবি শ্বশুর পারলে তাঁর মেয়েকে এখনই সম্প্রদান করে দেয়! সে একটি খচ্চর ব্যক্তি! সন্দীপ জানা সেটা বিলক্ষণ বুঝেছেন। পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে মত দিয়ে দেবে। তারপরে যা যা হতে পারে, তা ভেবে বহুবার সন্দীপ জানা মদনজ্বালা টের পেয়েছেন হাড়ে হাড়ে। কিন্তু কিছু করার নেই। বনানীর এসব ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি।

ফাঁকা রাস্তায় ধীরে সুস্থে বাইক চালাচ্ছিলেন সন্দীপ জানা। ফোন বাজছে দেখে চলন্ত অবস্থায় সেটা বের করে বললেন, 'হ্যালো!'

'আপনি তো ফোটো তুলতে আসছেন রাধু বর্মনের বাড়িতে?'

'কে?'

'আমি ওখানেই আছি। এলে একটু ফোন করবেন। আমার নাম নন্দন বর্মা। রাধুর বন্ধু। আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করব।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ— আমি তো আপনাকে... আচ্ছা, গিয়ে ফোন করছি।'

সন্দীপ জানা বাইক থামিয়ে ফোনটা কাটলেন। কল করলেন এবার রিয়াকে। দুটো রিঙের পর শোনা গেল রিয়ার উত্তেজিত স্বর, 'আরে! কোথায় আপনি?'

'ভৃগুবাবু এসে গেছেন?'

'তা নয়। বাড়িতে কত কিছু হচ্ছে। আমরা নাচানাচি করছি। ছবি তুলবেন না?'

'নন্দনবাবু ফোন করেছিলেন। আলাপ করবেন বললেন।'

'একজ্যাক্ট! আমার সামনেই আপনাদের মনোজবাবুর কাছে আপনার নাম্বার চাইলেন... একটু হোল্ড করুন!'

রিয়া বোধহয় নির্জন কোনও জায়গায় সরে গিয়ে প্রায় আধ মিনিট পর চাপা গলায় বলল, 'উনি যেচে আলাপ করার লোক নন। বনানীর ব্যাপারে কিছু বলবেন না যেন!'

'আরে না না! উনি কি এসব নিয়ে কথা বলবেন বলে মনে হয়?'

'আপনাদের মনোজবাবুকে উনি একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করেছেন তখন!'

'কী রকম?'

'রবির সঙ্গে এ বাড়ির কারোর আগাম জানাশোনা ছিল কি না।'

'উনি কি ডিটেকটিভ?' সন্দীপ জানা ফ্যাচ ফ্যাচ করে হাসলেন। 'বাজারে এখনও রবিকে নিয়ে অনেক গল্প চালু রয়েছে। তার দু-একটা ওনার কানে গেছে বোধহয়।'

ফোনটা পকেটে রেখে সন্দীপ জানা তখনই বাইকের গিয়ার বদলালেন না। তাঁর হঠাৎ মনে হল, নন্দন বর্মা এমন একটা প্রশ্ন করলেন কেন! তাঁর মত লোক স্রেফ হাওয়ায় ওড়া কথার ভিত্তিতে এটা জানতে চাইবেন? এটা ঠিক যে রবিকে নিয়ে শালগুড়িতে অনেক রটনাই ভেসে বেড়ায়। কিন্তু সে সব রবির চরিত্র বিষয়ক কাহিনি। নন্দনবাবুর প্রশ্নটা বেশ চমকে দেওয়ার মত।

কয়েক মিনিট বাইকের সিটে বসে ভাবার পর সন্দীপ জানা একবার মাথা ঝাঁকিয়ে পূর্ণোদ্যমে ছুটলেন। উৎসব মুখরিত বাড়ির উঠোনের এক কোনায় বাইক দাঁড় করিয়ে ফোন করলেন নন্দন বর্মাকে।

'আপনি এসেছেন?'

'আপনি কোথায়?'

'বাড়ির পেছন দিকে। চা বাগানের দিকটায় চলে আসুন।'

রিয়ার সঙ্গে দেখা না করেই বাগানের দিকে ছুটলেন সন্দীপ জানা। বাগানে রিয়া হলুদ শাড়ি পরে ছবি তুলিয়েছিল কয়েকটা। সরু পায়ে চলা পথ দিয়ে বাগানের ভেতরে বেশ খানিকটা ঢুকে যাওয়ার পর নন্দন বর্মাকে দেখা গেল। বাগানের শেষে ঢালু হয়ে জমিটার প্রান্তে, নদী খাতের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। নির্বিকার চেহারা। যেন প্রকৃতির শোভা দেখছিলেন।

'আপনি নাকি জানতে চেয়েছিলেন যে রবির সঙ্গে মনোজবাবুর ফ্যামিলির আগে জানাশোনা ছিল কি না!' একটু হাঁফাতে হাঁফাতে জিগ্যেস করলেন সন্দীপ জানা। 'ইনফর্মেশনটা কোত্থেকে পেলেন?'

'আপনার কি মনে হয়?' নন্দন বর্মা নির্লিপ্ত সুরে পাল্টা প্রশ্ন করেন। 'রবি সম্পর্কে ঠিক কী জানেন আপনি?'

'ওই যা বাজারে চালু।' সন্দীপ জানা শান্ত হলেন। 'আমাকে কিছু বলবেন বলেছিলেন?'

'রবি খুন হওয়া নিয়ে।'

'আমাকে বলবেন কেন?' সন্দীপ জানা এইবার সতর্ক হন। রবিকে নিয়ে তাঁর আগ্রহ আর বিশেষ নেই।

'আপনি ছাড়া এই আলোচনার যোগ্য কেউ নেই। চলুন। ওখানে একটু বসি।'

## ২৩

নদীর ওপাড়ে বাঁশবন। তার ওপাড়ে রাস্তা। হঠাৎ হঠাৎ গাড়ির হর্ন শোনা গেলে বোঝা যায় রাস্তা আছে। সন্দীপ জানা চারদিকে তাকালেন। বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করেছে হঠাৎ। একটু একটু বিরতি দিয়ে টানা হুস হুস শব্দে সে বাতাসের। চা বাগান আর নদীখাতের মাঝে ঢালু হয়ে আসা ঘাস জমিতে লুটিয়ে থাকা রোদ্দুর কিঞ্চিৎ ম্লান, কারণ আকাশে মেঘ জমছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কিন্তু মানুষের শব্দ নেই। দু-একবার শঙ্খ আর ঘন্টাধ্বনি ভেসে এসেছে বর্মনবাড়ি থেকে। গ্রাম দেবতার পুজো চলছে বোধহয়। দূরে আরও একটা বাড়ি। সন্দীপ জানা জানেন যে সেটা রিয়ার কাকাশ্বশুরের ঘর।

'জায়গাটা কেমন নির্জন সেটা বোঝাতেই এখানে বসতে বললাম।' নন্দন বর্মা শান্ত সুরে বললেন। 'রবি যেদিন ঘি নিতে এসে উধাও হয়ে যায়, সেদিন এই জায়গায় কিছুক্ষণ ছিল। প্রায় ঘন্টাখানেক। কিন্তু রাধুর বাড়ির লোকেরা সেটা জানত না।'

'এখানে কিছু হয়েছিল বলছেন?' সন্দীপ জানা একটু বিস্মিত হলেন। পরক্ষণেই চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে অনুভব করলেন, হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। হতেই পারে।

'ধরুন কিছু একটা হল। রবিকে এখানে মেরে নদীতে ফেলে দেওয়া হল। ভেবে দেখুন, এই নদীতেই কিন্তু লাশটা পাওয়া যায়।'

'মার্ডারটা সম্ভব।' সন্দীপ জানা একটু ভেবে বললেন। 'কিন্তু নদীতে ফেলতে গেলে কেউ না কেউ দেখত

লাশটাকে। নদীটা যে একেবারে নির্জন, তা কিন্তু নয় স্যার! এদিক থেকে হঠাৎ কেউ কেউ চলে আসে। ওদিক থেকেও মাছ ধরতে কি স্নান করতে লোকে নামে।'

'নদীর ধার ধরে দক্ষিণ দিকে খানিকটা এগিয়ে গেলে কেউ নামে না। দু-দিকেই পাড় অনেক উঁচু আর খাড়া। ধরুন, লাশটা সেখানে নিয়ে ভাসিয়ে দিল। নদী খাতও সেখানে একটু বেশি ডিপ।'

'লাশ নিয়ে যাওয়াটা কেউ দেখে ফেলতে পারত।'

'সময়টা যদি রাত হয়?'

সন্দীপ জানা এবার একটু অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, 'গুলিয়ে দিচ্ছেন স্যার! রবি এখানে দিনের বেলায় ছিল আর ও ফাইনালি এখান থেকে চলে যায়। মার্ডার স্যার শিঙ্গিহাটায় হয়েছে!'

নন্দন বর্মা একটু হেসে বললেন, 'আমার মনে হয় মার্ডার্র এখানেই হয়েছে। লাশ এখানেই কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। রাতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। তারপর আচমকা বৃষ্টি হওয়ায় অনেক দূর ভেসে চলে গেছে। রবি এখান থেকে শিঙ্গিহাটায় গেল, কিন্তু কেউ তাঁকে দেখল না চিনল না, এটা কি সম্ভব সন্দীপবাবু? রবি সেদিন এ বাড়ির সীমানা থেকে আর বের-ই হয় নি।'

'কিন্তু মোবাইল লোকেশান... ।'

'মোবাইলটা নিয়ে কেউ শিঙ্গিহাটায় চলে যায়। সুইচ অফ করে দিয়ে আবার নিয়ে এসে ঢুকিয়ে দেয় রবির প্যান্টের পকেটে।'

'কিন্তু কেন?'

নন্দন বর্মা উঠে দাঁড়ালেন। তার মুখে সামান্য বিষণ্ণতা ফুটে উঠল। তিনি যেন স্বগতোক্তির মত বললেন, 'রবির মার্ডারের সঙ্গে কোনও চক্রের যোগ নেই বলেই আমার বিশ্বাস। এটা এখানেই ঘটেছে। এখানকার কেউ এর সঙ্গে জড়িত।'

'মাই গড!' সন্দীপ জানা একটু ঘাবড়ে গেলেন। 'বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, বাট, না করেও থাকতে পারছি না স্যার। আমারও এদিকে বেশ কিছু দিন থাকা হল। এ বাড়ি থেকে ভ্যান রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে শিঙ্গিহাটা গেলে কেউ না কেউ রবিকে দেখতই। আপনার বন্ধুর দোকানের কর্মচারিদের এ তল্লাটের লোকেরা প্রায় সবাই চেনে। এখানে সেদিন হাট ছিল। দুপুরের দিকে শিঙ্গিহাটা থেকে অনেকেই এদিকে আসছিল সেদিন। আপনি ঠিক বলেছেন স্যার! রবি শিঙ্গিহাটায় যায় নি সেদিন। কিন্তু এখানে তাঁকে কে খুন করবে স্যার?'

'এটা যদি কেউ জেনে থাকে তবে সে রাধুর বাড়িরই কেউ জানবে মিস্টার জানা! অবশ্য ওপাড় থেকে নদী পেরিয়েও কেউ আসতে পারে। কিন্তু আগেই বলেছি— খুনটা বাইরে থেকে কেউ এসে করেনি বলেই আমার বিশ্বাস।'

সন্দীপ জানা চুপ করে কিছু ভাবলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। তারপর বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, ইয়ে মানে আমি আসলে আমার সঙ্গে একটা মেয়ের রিলেশন হয়েছে। আমরা বিয়ে করব... ।'

'তাই?'

'মেয়েটার নাম স্যার বনানী। সে ভুল করে কয়েকদিন রবির সঙ্গে রিলেশান করেছিল স্যার। আমাকে বলেছে।'

'শালগুড়ির মেয়ে?'

'হ্যাঁ স্যার! এক মাসের মত রিলেশান ছিল রবির সঙ্গে। তারপরেই মার্ডারের ব্যাপারটা ঘটে।'

'আপনার হবু স্ত্রী কি রবির ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলেছে?'

'দু-তিনদিন ওদের দেখা হয়েছিল। রবি বেশ খরচ করত। একটা গিফটও দিয়েছিল স্যার। নেলপালিশ। তেরশ নব্বই টাকা দাম। ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত না স্যার? রবি ক-টাকা মাইনে পেত? আর, মোবাইল ব্যাপারটাও নাকি ভাল জানত স্যার।'

'শেষ তিন মাস রবি মাইনেও তোলে নি। এ বার বলুন, এমন একটি ছেলে শালগুড়ির মত জায়গায় মুদির দোকানের কর্মচারি হয়ে আসবে কেন? মাথাভাঙ্গাতেই কিছু না কিছু করতে পারত। আই অ্যাম শিওর মিস্টার জানা, কাজের উদ্দেশ্য নিয়ে শালগুড়িতে আসে নি সে।'

এরপর কিছুক্ষণ দু-জনেই নীরবে প্রকৃতির শোভা দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর নন্দন বর্মা স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'চলুন! ওদিকটায় একটু হেঁটে আসি।'

একটু দূরে গাছপালার ফাঁকে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা জমি চোখে পড়ে। সেদিক ইঙ্গিত করলেন নন্দন বর্মা। সন্দীপ জানা জানেন সেটা সংসারে ভাঙা-চোরা-বাতিল জিনিসে ভর্তি। কিন্তু সেখানে কী থাকতে পারে?

নন্দন বর্মা হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'রবির সঙ্গে থাকা ভ্যান রিক্সাটা পাওয়া যায় নি।'

বেড়ায় ঢাকা জমিতে বহু বিচিত্র বাতিল জিনিসের সঙ্গে রকমারি কাঠের টুকরো, গাছের শুকনো ডাল স্তূপ করে রাখা ছিল। কিন্তু কোনও কিছুকেই ভ্যান রিক্সার অংশ বলে মনে হচ্ছিল না। নন্দন বর্মা ম্লান হেসে বললেন, 'রিক্সাটা হয়ত এতদিনে নষ্ট করা হয়ে গেছে।

**'খুনের রহস্য ভেদ না হলে রাধু শান্তি পাবে না। রবিকে শেষ তাঁর বাড়িতেই দেখা গেছে। আর, আমার ধারণা সে বাড়িতে কিছু একটা হয়েছিল যেটা হয় তো কেউ জানে।' ভৃগু জ্যোতিষ কিছু বললেন না। চুপ করে ভেন্টিলেটরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। নন্দন বর্মা বললেন, 'মনে হয় সে রিয়াকে জানত। হয় তো এমন ভাবে জানত যাতে রিয়া তাঁকে দরকারে টাকা দিতে বাধ্য থাকে। সোজা ভাষায় যাকে বলে ব্ল্যাকমেল।'**

পুলিশ এখানে তদন্ত চালাবার মত কিছুই অনুমান করে নি। করলে হয় তো রিক্সাটা এখানেই পেত... ।'

নন্দন বর্মা থেমে গেলেন। কয়েক পা এগিয়ে অনেকগুলো থার্মোকলের বাক্সর আড়াল থেকে একটা টিন দেখা যাচ্ছে। বাক্সগুলো একটু সরাতেই টিনটা স্পষ্ট হল। সেটাকে একটু লক্ষ্য করার পর নন্দন বর্মা ডাকলেন, 'দেখে যান সন্দীপবাবু!'

সন্দীপ জানা কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এসে দেখলেন। তেলের টিন যেমন হয় তেমনই। মুখটা পুরো কাটা। ভেতরে খানিকটা জল।

'টিনের গায়ের লেখাটা দেখুন। ঘি-এর টিন ছিল এটা।'

'রবি যে টিন দুটো নিয়েছিল তার একটা?' সন্দীপ জানা সন্দেহের সুরে বলেন। 'অন্য কোনও টিনও তো হতে পারে। এদের বাড়িতে তো টিনের অভাব নেই।'

'এই সব টিনের রিসেল ভ্যালু আছে সন্দীপবাবু। তবে, এটাই যে সে টিন দুটোর একটা, তার কোনও প্রমাণ নেই। চলুন।'

সন্দীপ জানা আরও কয়েক সেকেন্ড টিনের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। সব কিছু কেমন গোলমেলে লাগছে। নন্দন বর্মার কোথাও ভুল হচ্ছে না তো! হাজার হলেও বয়স হয়েছে।

'আপনেরে ডাকাসে!'

অকস্মাৎ একটি মহিলা কণ্ঠ শুনে দু-জনেই একটু চমকে পেছনে তাকালেন। নন্দন বর্মার দেখলেন একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। বয়স বেশি নয়। ভরন্ত চেহারা। মুখটা শিশুর মত সরল। চোখে একটু বিষণ্ণতা। পরনে সাধারণ একটি নাইটি।

'কী ব্যাপার গুবলি?' সন্দীপ জানা এগিয়ে গেলেন। 'আমাকে ডাকছে নাকি?'

'কাকি ডাকাসে। জ্যোতিষ আসিল্।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। চল!' সন্দীপ জানা একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ক্যামেরার ব্যাগ তাঁর ঘাড়েই ঝুলছিল। সেটা হাতে নিয়ে দ্রুত পায়ে হাঁটা দিলেন। গুবলি কয়েক পা হেঁটে একবার থামল। তারপর পেছনে থাকা নন্দন বর্মাকে শান্ত গলায় বলল, 'আপনে উত্তে ঘুইরবেন না। সাপ নিক্‌লাইতে পারে।'

নন্দন বর্মা কিছু বললেন না। তিনি দেখলেন গুবলি ধীরে সুস্থে ঢালু জমি বেয়ে উঠে গাছপালা আর চা বাগানের মধ্যে মিলিয়ে গেল। নন্দন বর্মা তার পরেও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। যুক্তিপরম্পরার সুতোয় থাকা একটা জবরদস্ত গিঁট হঠাৎ করে খুলে যাচ্ছিল যেন। নন্দন বর্মা নিশ্চল দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন। এক সময় ভাবনা থামল। তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন বর্মন বাড়ির ডাম্পিং ফিল্ড থেকে।

২৪

যজ্ঞ বেশ জমিয়ে হল। সন্ধে নাগাদ কীর্তনের আসর শুরু হলে নন্দন বর্মা বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরের উঠোনে এসে দেখলেন মনোজ একটা চেয়ারে বসে মোবাইল ঘাঁটছে। নন্দন বর্মাকে দেখে হেসে বলল, 'যাচ্ছেন নাকি?'

'গত দু-দিন তোমাদের বাগানের দিকটা ঘুরলাম। বেশ লাগল।'

'রিয়া কসে। আপনি আর মাস্টার মিলে খুব নাকি সময় কাটাইসেন সেই খানে। জাগাটা কিন্তু ভাল্।'

'কিছু পুড়িয়েছিলেন নাকি সেখানে? এর মধ্যে?'

'পুড়াইসি?' মনোজকে একটু ভাবিত দেখায়। 'এর মধ্যে তো কিসু পুড়াই নাই।' তারপর সোজা হয়ে বসে বলল, 'নবান্নের আগৎ। আল্টাং ভাল্টাং ম্যালা জমি গেইল্। ফ্যালার জাগাখান দেখিসেন না? রিয়া কইল্ জাগা ফুল হয়্যা গিসে।'

'কেরোসিন দিয়ে?'

মনোজ প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে খুব হাসল। এবার অ্যালকোহলের মৃদু গন্ধ পেলেন নন্দন বর্মা। একটু হেসে বললেন, 'যজ্ঞে দেখলাম ঘি দিয়ে ভালো আগুন ধরান যায়। তাই মনে হলো ঘি দিয়ে আবর্জনা পোড়ালে নাকি?'

মনোজ হাসতে হাসতে ফেটে গেল। কোনও রকমে বলল, 'দারুন কাথা কসেন এলায়! ঘি দিয়া আগুন দিসে— হো হো হো!

অনেক রাতে, যজ্ঞিবাড়ি যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন ঘুমিয়ে পড়ার আগে মনোজ যখন জড়ান গলায় কথাটা রিয়াকে বলার পর হাসার চেষ্টা করে ঘুমিয়ে পড়ল। রিয়া অপলকে তাকিয়ে থাকল ঘুমন্ত স্বামীর মুখের দিকে। তাঁর আর বাকি রাত ঘুম এল না।

*(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)*

বই পত্রের ডুয়ার্স

# বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী

## উত্তরবঙ্গের অনামী ব্রাত্য আখ্যান কাব্য

কবি শাফাতুল্লা সরকার-এর 'বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী' আখ্যানধর্মী কাব্যটির দশম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৭-তে। এই সংস্করণটির সম্পাদনা করেছেন আব্দুল রহিম আলম সরকার। সম্পাদক আব্দুল রহিম আলম সরকার 'বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী'র দশম সংস্করণের ভুমিকায় লিখেছেন '...গ্রন্থটি ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার গন্তসিয়া লাইব্রেরী হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এবং পর্যায়ক্রমে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে নবম সংস্করণ শেষবারের মতো প্রকাশিত হইয়া দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। দুঃখের বিষয় এটাই যে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পর্যায় ক্রমে প্রকাশিত হইলেও বাংলার শিক্ষিত-পণ্ডিত মহলের সমাদর হইতে গ্রন্থটি বঞ্চিত ছিল। যতদূর জানা যায় কোচবিহার জেলা, জলপাইগুড়ি জেলা, বাংলাদেশের রংপুর জেলা এবং উত্তরবঙ্গের আরো বেশ কিছু এলাকার অল্প শিক্ষিত সাহিত্য রসিকদের কাছেই বইটির জনপ্রিয়তা ছিল বেশী...'। সম্পাদক আলম সরকারের মনে অভিমানের স্পর্শ লেগে আছে এই কারণে যে গ্রন্থটির প্রতি বাংলা সাহিত্যের গবেষক, শিক্ষিত-পণ্ডিত পাঠক বর্গের কাছে যথোচিত ঠাঁই পায়নি বলে। ২০১৮'র ডিসেম্বরের এক সকালে আলম সরকার বইটি নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন যদি বইটি উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ বা সমগ্র বঙ্গের রসিক পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। প্রসঙ্গত আব্দুল রহিম আলম সরকার কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ মহকুমার পানিশিলা গ্রামের অধিবাসী। 'বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী'-র রচয়িতা শাফাতুল্লা সরকার-এর প্রপৌত্রীর বংশধর তিনি।

উত্তরবঙ্গে রচিত বাংলা সাহিত্যের পরিসরে শাফাতুল্লা সরকারের 'বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী' এক উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই বাংলা সাহিত্যে প্রণয়মূলক আখ্যান কাব্যের ধারা প্রবহমান ছিল। 'ইউসুফ-জোলেখা' 'লোর চন্দ্রাণী' 'বিদ্যাসুন্দর' পালাগানের ধারা যে উত্তরবঙ্গেও ছিল এবং এখনও আছে 'বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী' তার প্রমাণ। এখনও এর আখ্যানকে আধার করে নাটক, যাত্রা, পালাটিয়া পরিবেশিত হয়। উত্তরবঙ্গের লোক সমাজে পরম সমাদর রয়েছে 'বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী' আখ্যানের। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নানা বৈশিষ্ট্য আছে এই গ্রন্থে। কলপ নগরের ঐশ্বকেতুর পুত্র বিশ্বকেতু এবং রত্নপুরীর রাজা চন্দ্রসেনের কন্যা চন্দ্রাবলীর প্রণয় আখ্যানই এই কাব্যের মূল উপজীব্য। মর্ত্যের নায়ক বিশ্বকেতুর সঙ্গে স্বর্গের পরী চন্দ্রাবলীর প্রেম। তার পূর্বে চন্দ্রাবলীর শাপগ্রস্ত হবার কাহিনি। রূপবতী চন্দ্রাবলীর নৃত্যে মুগ্ধ ও কামাতুর হয়ে পড়েন দেবরাজ পুরন্দর। চন্দ্রাবলীর সঙ্গে আলিঙ্গন

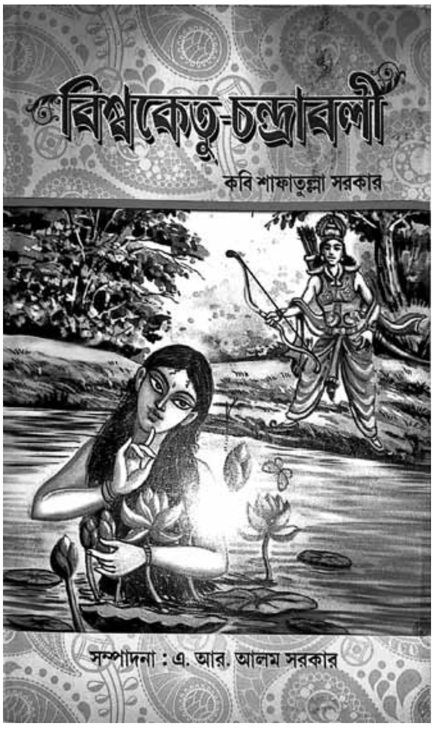


**উত্তরবঙ্গের এক প্রত্যন্ত গ্রামে বসে শাফাতুল্লা কাব্যটি রচনা করেন। মধ্যযুগে প্রাপ্ত প্রণয়মূলক আখ্যান কাব্যের মুখ্য রূপকার হিসেবে উত্তরবঙ্গের মুসলমান কবিদের মধ্যে শাফাতুল্লা সরকার স্বতন্ত্র অভিনিবেশ দাবি করে। শাফাতুল্লা প্রতিভাধর কবি। অসাম্প্রদায়িক এই কবি হিন্দুর শাস্ত্র-পুরাণ গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন। ধর্ম নিরপেক্ষ রোমান্টিক বাংলা প্রণয় কাব্যধারায় 'বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী' নিঃসন্দেহে স্থান পাবার যোগ্য। দুই বাংলার পাঠকের কাছেই সমান আদরণীয় হতে পারে।**

ও সম্ভোগের ইচ্ছা প্রকাশ করলে চন্দ্রাবলী তা প্রত্যাখান করেন। ফলে পুরন্দর চন্দ্রাবলীকে অভিশাপ দেন মর্ত্যের বনে চন্দ্রাবলী বারো বৎসর হরিণী হয়ে জীবন কাটাবে। রাজপুত্র বিশ্বকেতু হরিণীরূপী চন্দ্রাবলীকে শাপমুক্ত করলে, চন্দ্রাবলী হরিণী রূপ থেকে পরীরূপ ফিরে পেয়ে স্বর্গে ফিরে যাবে। বিশ্বকেতু চন্দ্রাবলীর সঙ্গে মিলনের জন্য অধীর হয়ে ওঠে। চন্দ্রাবলী তাকে ধরা দেয় না। এর মধ্যে চিত্রমালার আখ্যানও আছে। রাক্ষসের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য বিশ্বকেতু তাকে বিবাহ করে অবশেষে নানা ঘটনার বিস্তারের পর বিশ্বকেতু ও চন্দ্রাবলীর বিবাহ-মিলন সম্পন্ন হয়—

"আশীর্বাদ ছিলা রাজা রাজ্য অধিকারী।
যুগে যুগে রাজ্য বার কলকা নগরী।।
বিশ্বকেতু রাজা হৈল কোলাপুর ধামে।
দেশে দেশে দোহাই ফিরিল তাঁর নামে।।
রাণী হৈল চিত্রমালা চন্দ্রাবলী পরী।
কবি শাফাতুল্লা বলে উজ্জ্বলিল পুরী।।

এই কাহিনি সমাপ্তির পর কবি শাফাতুল্লা কোচবিহার বর্ণনা, কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের বংশ বর্ণনা, রাজসভা বর্ণনা, পুর বর্ণনা এবং সবশেষে গ্রন্থকারের পরিচয় দিয়ে গ্রন্থ সমাপ্ত করেছেন।

'বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী'র রচনাকাল জ্ঞাপক নির্দিষ্ট সাল-তারিখ নেই। তবে তাঁর গ্রন্থে কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের উল্লেখ আছে। নৃপেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকাল ১৮৬৩-১৯১১, অনুমান করা যায় এই সময়েই কাব্যটি রচিত হয়েছিল। 'শাফাতুল্লা ঃ কাব্যকথা ও কবিকথা' আলোচনায় অধ্যাপক শেখ মকবুল ইসলাম লিখেছেন— "কবি শাফাতুল্লার জন্ম তারিখ পাওয়া বেশ কঠিন কাজ। তাঁর একমাত্র পুত্রও কবির মৃত্যুর কিছুদিন পরে লোকান্তরিত হন। সচেতনভাবে কেউ কবির সম্পর্কে সঠিক তথ্য বা নথি সংরক্ষণ করেননি। কবি বংশের উত্তরসূরীদের সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছে আনুমানিক ১৮৪৭-১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই কবির জীবৎকাল হওয়া সম্ভব। স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্বে এবং সিপাহী বিদ্রোহের ১০ বছর পূর্বে কবির জন্ম হয়ে থাকবে বলেই এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন— এমনটাই অনুমান করা যেতে পারে।"

এই কাব্যের অনেকাংশই মঙ্গল কাব্য দ্বারা প্রভাবিত, বিশেষ করে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'। মঙ্গল কাব্যের কবির মত তিনিও আত্মপরিচয় দিয়েছেন—

'শুন শুন সদাশয় অধীনের পরিচয়,
সভাস্থ সকল বন্ধুগণ।

ভুবন বিখ্যাত নাম        রাজ্য কোচবিহার ধাম,
কালে কালে তথায় বসতি।
পিতামহ গুণধাম,        চেল্টু সরকার নাম,
ছিল অতি শুদ্ধশান্ত মতি।।'

মূলতঃ পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে এই কাব্যগ্রন্থটি রচিত। এ কাব্যের ভাষা প্রসঙ্গে ড. শেখ মকবুল ইসলামের মন্তব্য উদ্ধৃত করছি— "ভাষার বিচারে কাব্যটি উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত। সাবলীল মান্য বাংলার এক অনবদ্য রচনা।"

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে শাহ মুহম্মদ সগীর, দৌলত কাজীর, 'ইউসুফ জোলেখা', 'লোর চন্দ্রাণী' যে রোমান্টিক প্রণয় কাব্যধারার প্রবর্তন করেছিলেন, 'বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী' অনেকটাই তারই অনুসারী। উত্তরবঙ্গের এক প্রত্যন্ত গ্রামে বসে শাফাতুল্লা কাব্যটি রচনা করেন। মধ্যযুগে প্রাপ্ত প্রণয়মূলক আখ্যান কাব্যের মুখ্য রূপকার হিসেবে উত্তরবঙ্গের মুসলমান কবিদের মধ্যে শাফাতুল্লা সরকার স্বতন্ত্র অভিনিবেশ দাবি করে। শাফাতুল্লা প্রতিভাধর কবি। অসাম্প্রদায়িক এই কবি হিন্দুর শাস্ত্র-পুরাণ গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন। ধর্ম নিরেপেক্ষ রোমান্টিক বাংলা প্রণয় কাব্যধারায় 'বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী' নিঃসন্দেহে স্থান পাবার যোগ্য। দুই বাংলার পাঠকের কাছেই সমান আদরণীয় হতে পারে।

বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী মূলত প্রেমমুখ্য কাব্য। তাই সেখানে লোকজীবন রসে লোক প্রভাব থাকাটাই স্বাভাবিক। এই কাব্যে রূপকথার আবহ আছে। তবে রূপকথা গদ্যে লেখা হয়। 'বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী' পদ্যে রচিত। তবে এই কাব্যে বেশ কিছু অলৌকিক ও অসম্ভব ঘটনার অবতারণা আছে। মৃগী থেকে আবার চন্দ্রাবলীর শাপমুক্তি ঘটানোয় অলৌকিকতা আছে, তবে সেই অলৌকিকতা লোকজীবন কেন্দ্রিক। এই কাহিনিকে আশ্রয় করে উত্তরবঙ্গের লোক সমাজে বহু নাটক, পালা গানের অনুষ্ঠান হয়েছে। এই কাহিনি আজও যে বেশ জনপ্রিয় তা গ্রন্থটির দশম সংস্করণ প্রকাশই প্রমাণ করে।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই মুসলমান কবিরাই মূলত বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের ধারা উন্মুক্ত করেন। উত্তরবঙ্গেও সুফী সাধকরা এসেছিলেন, তারা উত্তরবঙ্গের লোকসমাজে ধর্ম ও সম্প্রদায়গত ভেদাভেদের ঊর্দ্ধে প্রেম ও মনুষ্যত্বের সমন্বয়বাদী আদর্শের জয়গান ঘোষণা করেছেন। শাফাতুল্লা সরকারের 'বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী' কাব্যে সুফি প্রভাব ধর্মনিরেপেক্ষ মানবিক আবেদন ঋদ্ধ কাব্যরচনার প্রবণতাকেই বহন করে। প্রতিভার স্পর্শে যেভাবে চিত্রিত হয়েছে, তার শিল্পগুণ নান্দনিক গুরুত্ব নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হয়।

এ ধরনের একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করে তা প্রকাশ করবার জন্য আব্দুল রহিম আলম সরকার অবশ্যই ধন্যবার্দাহ। গ্রন্থটি প্রকাশ করে কবি শাফাতুল্লা সরকারের উত্তরসূরী হবার গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত অধ্যাপক ড. মকবুল ইসলাম রচিত 'শাফাতুল্লা ঃ কাব্যকথা ও কবিকথা' আলোচনাটি প্রশংসার দাবি রাখে। বইটি এই সময়েও পাঠক সমাজে আদৃত হবার অপেক্ষা রাখে।

**বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী ঃ সুরস-সংযুক্ত নব কাব্য এবং অত্র গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনী সম্বলিত সংগৃহীত। কবি শাফাতুল্লা সরকার প্রণীত। আব্দুল রহিম আলম সরকার, সম্পাদিত। দশম সংস্করণ। মেখলিগঞ্জ কুচবিহার ঃ মুক্তচিন্তা সাহিত্য অনুশীলন কেন্দ্র, ২০১৭। মূল্য ১৬০ টাকা।**

**রণজিৎকুমার মিত্র**

## রাসায়নিক রস

# অনুপ্রাণিত আবোল তাবোল

দেকুন সার! বাঙালি যে লজিক প্রিয় সেটা তো অমোত্ত সেন প্রুফ করে দিয়েচেন! কিন্তু যেই মুখ্যমন্ত্রী কিচু করল, অমনি সার লজিক-মজিক ভুলে রে রে করে উঠলেন! এই যে সার সব কিছুতে আপনাদের 'হারে রে রে' করে ওঠাটা— এইটা সার সিপিয়েম কালচার। মুখ্যমন্ত্রী ধন্নায় বসচে দেকে অত চুলকোলেন কেন বলুন তো? সিম্পিল লজিক দিয়ে ভেবে দেকুন! ভেরি ইজি।

প্রথম কতা হল, আগে কোনও সিএম ধন্নায় বসেন নি? আরে বাবা! সিএম ধন্নায় কার এগেনস্টে বসে? সেন্ট্রালের এগেনস্টেই তো? বিধানবাবু-সিধ্যাতবাবুদের টাইমে সেন্ট্রাল-স্টেট একটাই পার্টি ছিল। ধন্নার দরকার হয় নি। সিপিয়েমের স্কোপ ছিল। কিন্তু জ্যোতি-বুদ্ধবাবুদের সার পার্সোনাল ডিসিশান বলে কিস্যু ছিল না সার! ধরুন, জ্যোতিবাবু ভাবলেন বসবেন। তিনি জানালেন। অ-নে-ক আলোচনার পর কেরল কমিটি যকন পার্মিশান দিল, ইলেকশন দুয়ারে খাড়ায়ে! ধন্না হলো না।

কিন্তু প্রেজেন্ট সিএম-এর সার কোনও চাপ নেই। যা ভাববে সেটাই হবে। নো পলিটব্যুরো, নো সমন্বয় কমিটি। তাই যেই ভেবেছেন সেই বসেছেন। আপনারা পারেন নি তাই সার গালি দিচ্ছেন।

জানি সার! গায়ে লাগছে বলে সিবিআই বনাম পুলিশ ফাইট নিয়ে আপনার লজ্জা লাগচে। ইমোশনাল ছেড়ে প্যাকটিকাল ভাবুন সার। অমোত্ত সেনের লজিক দিয়ে ভাবুন! সেন্ট্রালে যেই থাকে সেই নাকি সিবিআই-কে কাজে লাগায়। তা সার এটা যদি হয় তবে স্টেটের হাতেও আনঅফিশিয়ালি 'সিবিআই ঠেকাও' পাওয়ার থাকা উচিত। সিম্পিল কেস সার! সেন্ট্রাল যদি সিবিআইকে নিজের মত লাগায় তবে স্টেটও তাকে নিজের মত ঠেকাতে পারবে। আইনের আইনে সব ইকোয়েল সার। সিবিআই দিয়ে হামলা হলে পুলিশ দিয়ে পোটেকশন।

কিন্তু এই লজিকটা আপনারা তুলচেন না! চিট ফান্ডের টাকা ফেরৎ দেওয়া নিয়ে খুব চ্যাঁচাচ্চেন! আরে মশয়! গরীবের টাকা একবার মারিং হলে তা কি রিটার্ন আসে? ফান্ডের টাকা মুখ্যমন্ত্রী জানেন আর মুকুল জানেন না? খারাপ লাগে সার! আপনাদের লজিক বোধ খুব উইক। ব্যাড সেন্স অব লজিক মেকিং! সত্যি বলতে কি সার, মিত্রবাবু প্রধান মন্ত্রী হলে মহাদিদিও প্রধানমন্ত্রী হতে পারে। মোদি-দিদির কি এমন ফারাক দেখচেন যে 'পদ্ম চাই পদ্ম চাই' বলে মূর্চ্ছা যাচ্চেন সার? এত সেন্টিমেন্টাল হলে ফুলের অলটারনেটিভ ফুলই আনবেন। এপ্রিল ফুল হবেন আবার। এই লজিকটাও ভাবার মত।

তাই বলি কি সার, মোদি-দিদি বরং আরো টেন ইয়ার থাক। কোথাও তো কাজকম্ম বাকি পড়ে নেই। একন জগোৎ সভায় বেস্ট সিট পাওয়ার জন্য গলিতে গলিতে মন্দির বিল্ড করতে হবে। রাজ্যে সার মন্দির বাই কালার হবে। নীল-সাদা। ট্রাই কালারও চলবে। নীল-গেরুয়া। মাঝখানে সাদা। লজিকাল সেকুলার অনুপ্রাণিত মন্দির।

তবে সার লজিকটা লিকে নিন। তারপর কিছু টাকা তো দেবেনই সার। হয় অনুপ্রাণিত হয়ে দিন নয় দেশমাতার নামে দিন। সেন্ট্রালে মোদি আর ক্যালকাটায় দিদি সার আমাদের ফিউচার। থাকতেই হবে! নইলে সার গোটা ইন্ডিয়া বিরোধিদের হাতে চলে যাবে। বিরোধিরা খুব খারাপ হয় সার। মনু বলে গেছেন। বিরোধিরা হলো রাক্ষস। পুরাণে সার বিরোধিদের অসুর বলা হয়েচে। বিশ্বাস না হলে ফেসবুকের পোস্ট দেকুন। রাজ্যের বিরোধিরা সব মনসা সার! দিদি একের পর এক চাঁদ সওদাগরদের স্টেটে বিজনেস করাতে ডেকে আনছে— সব বিরোধিরা ডুবিয়ে দিচ্চে, জানেন?

লোকসবায় কিন্তু সে-ই ফাইট হবে! সব অঙ্ক মিলে গেলে দেকবেন ফুলে ফুলে ড্র। অবশ্য ফিউচার দিদি পিএম হলেন আর দিলীপবাবু সিএম— এটাও পসেবল! না না সার! ম্যাজিক মাশরুম সেবন করিনি। টাচ উড! পলিটিক্স হলো পসিবিলিটি। এখানেও ভাবার মত লজিক আছে সার! হতেই পারে যে পদ্মেরা সেন্ট্রাল পেল না, বাঙলা পেল। দিলীপবাবুকে সিএম করে দিদি গেলেন দিল্লি। ছ-মাস কাটল। মহা ভাইপোকে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে দিলীপবাবু রিটায়ার দিলেন। তিনি হলেন গুজরাটের রাজ্যপাল।

সব পসিবল সার। আপনারা মানতে চান না তাই হিংসে করেন। জেলাসি দিয়ে কী লাভ সার? হয় মোদির মত চলুন নয় দিদির মত। বিরোধি হলে সার চিরকাল চামড়া জ্বলবে। চাণক্য কবেই বলে গেচেন। তবে টাকা যকন দেবেন তকন একটা ফ্রি এডভাইস নিন। ভোটের চাইতে লাইফের ভ্যালু বেশি। এমন কোনও লিডার নেই সার যার জন্য আপনি লাইফ দেবেন। কোনও শালা আপনার লাইফের যোগ্য লিডারই না!

টাকাটা এবার ছাড়ুন সার! অনেক বকেচি। টায়ার লাগচে। চাঙ্গা হওয়ার জন্য কয়েক ঢোঁক অনুপ্রেরণা চাই।

**অনু ঘটক**

# ডুয়ার্সের বই। রংরুট-এর বই

## আমাদের বইপত্র এখন নিজের ঠিকানাতেই পেতে পারেন

### বিষয় ডুয়ার্স

**তিস্তা - উৎস থেকে মোহনা।** অভিজিৎ দাশ। ২৫০ টাকা
**ডুয়ার্স থেকে দিল্লি।** দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা ***
**চায়ের ডুয়ার্স কী চায়?** গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা
**ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?** সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা ***
**আলিপুরদুয়ার।** প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
**কোচবিহার** ২য় সংস্করণ। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা

#### ডুয়ার্সের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা ***
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
সব গল্পই প্রেমের নয়। হিমি মিত্র রায়। ১৬০ টাকা

#### পেপারব্যাক সিরিজ

**ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস।** সংকলন। ১৯৫ টাকা
**তরাই উৎরাই।** শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৬৫ টাকা
**লাল চন্দন নীল ছবি।** অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা
**অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন।** বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
**মেঘের পর রোদ।** মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
**কুহুলিয়াদের দেশে।** সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

#### ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

**পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান।** অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
**ডুয়ার্সের হাজার কবিতা।** অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা
**বোধিবৃক্ষ ছুঁয়ে এক চির ভিক্ষুক।** অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

### বিষয় পর্যটন

**আমাদের পাখি।**
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা
**সিকিম।** সংকলন। ২০০ টাকা ***
**নর্থ ইস্ট নট আউট।**
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা
**রংরুটে হিমালয় দর্শন।**
সংকলন। ২০০ টাকা ***
**উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে।**
প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা ***
**সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে।** সংকলন
১৫০ টাকা ***
**মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।**
সুভদ্রা উর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা ***
**সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।**
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা ***

**প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন।** তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা
**জয় জল্পেশ।** শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

**অরণ্য কথা বলে।**
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা ***
**সে আমাদের বাংলাদেশ।**
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা
**পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।**
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
**তিন মহাদেশ দশ দিগন্ত।**
শান্তনু মাইতি। ১৭৫ টাকা

**বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।**

**হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৬২৯৭৭৩১১৮৮ নম্বরে**

**ন্যূনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।**
**পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।**

**আমাদের বই যে সব দোকানে পাওয়া যায় (বই না পেলে অর্ডার করুন )**

**কলকাতা: দে'জ ও দে বুক স্টোর,** কলেজ স্ট্রিট। **রিড বেঙ্গলি বুক স্টোর** ৪২ এ সর্দার শংকর রোড, কলকাতা ২৯। ফোন ৮১০০৯০৫৫৬৬
**শিলিগুড়ি: বিশ্বাস বুক এজেন্সি,** হিলকার্ট রোড বাটা গলি। **জলপাইগুড়ি: ভবতোষ ভৌমিক** কমার্স কলেজের বিপরীতে **আলিপুরদুয়ার: ম্যাগাজিন সেন্টার** কলেজ হল্ট। **কোচবিহার: দাস নিউজ এজেন্সি** বড় পোস্টাপিসের বিপরীতে। **ফালাকাটা:** পাঞ্চজন্য। **মালবাজার: বইঘর,** আদর্শ বিদ্যাপীঠের উল্টোদিকে। **বিন্নাগুড়ি:** সিটি বুক স্টল। **বানারহাট:** গ্রন্থ ভারতী। **বীরপাড়া:** পোকিসা। **মালদা:** পুনশ্চ। **রায়গঞ্জ:** ধানসিঁড়ি।

**অনলাইনে কিনুন আমাদের বইপত্র www. readbengalibooks.com**

EKHON DUARS, Vol-5, Issue-11 WBBEN/2014/56733, Rs. 20 Only

# ডুয়ার্স প্যাকেজ টুর

২ রাত ৩ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সামসিং-সুনতালেখোলা
৩ রাত ৪ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সুনতালেখোলা-জল্পেশ
তিনবিঘা-কোচবিহার।
৪ রাত ৫ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সামসিং-সুনতালেখোলা
জল্পেশ-তিনবিঘা-কোচবিহার-জলদাপাড়া-বক্সা।
নিউ জলপাইগুড়ি/নিউ মাল থেকে,
ইকনমি/ডিলাক্স প্যাকেজ
যোগাযোগ ৯৮৩০৪১০৮০৮/৯৯০৩৮৩২১২৩

## DHUPJHORA SOUTH PARK

Murti, Gorumara NP
Jalpaiguri, West Bengal

**Accommodation:** Super Delux Room (DBR) 4 nos, Delux Ethnic Rooms (DBR) 4 nos, Standard Family Rooms (4-6 BR) 5 nos.

Common Dine-in place for breakfast- lunch- evening snacks-dinner,
Conference Hall;

Cycling, Angling, Adventure sports like Burma Bridge, Cylinder Walk, Bosun Chair, Commando Walk and Zip Line.

**Marketing & Booking Contact:**
Kolkata 9903832123, 9830410808
Siliguri 9434442866, 9002772928

মোহিনী
মূর্তির পাড়ে
আয়েশের
সঙ্গে মেশে
রোমাঞ্চ

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.